শাশ্বত সত্য



২য় বর্ষ • ২০২৬ ইং

৩য় সংখ্যা • ১৪৩৩ বং

জুন-জুলাই-আগস্ট

শাশ্বত সত্য

১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয় | অভিমত



এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার মাধ্যমে যে জ্ঞান, চিন্তা ও সত্যের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার প্রকৃত মূল্য ও গভীরতা তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন, যাঁরা পত্রিকাটি মনোযোগ দিয়ে পড়বেন এবং বিষয়গুলোকে হৃদয়ে ধারণ করার চেষ্টা করবেন। একারণেই যত প্রতিকূলতাই আসুক, যত কর্মব্যস্ততাই থাকুক, আমি ও আমার টিম, অর্থাৎ সমগ্র পত্রিকা কমিটি, সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে চলেছি এই জ্ঞানচর্চার ধারাটিকে অব্যাহত রাখতে।
আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো। বরাবরের মতো এবারও এতে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তনীয় নানা বিষয়ের ওপর মূল্যবান লেখা। অথচ অনেকেই এখনও পত্রিকার লেখাগুলো যথাযথভাবে পড়ছেন না। তিন মাস, অর্থাৎ ৯০ দিন একটি পত্রিকার প্রতিটি লেখা ধীরে ও মনোযোগ দিয়ে পড়ে বোঝার জন্য যথেষ্ট সময়। আপনাদের মনে জাগ্রত বহু প্রশ্নের উত্তর হয়তো এই পত্রিকার কোনো না কোনো প্রবন্ধের মধ্যেই খুঁজে পাবেন। প্রশ্নোত্তর পর্বের পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় সংস্কৃত শব্দ ও বাক্য শেখার কলামটিও আপনাদের জন্য উপকারী হবে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমরা এই পত্রিকার অঙ্কীয় প্রতিলিপি (digital copy) আপনাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। তাই এই প্রচেষ্টার প্রতি আপনাদেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। যাঁরা আমাদের পত্রিকা পড়ছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ - ভালো, মন্দ, প্রশংসা কিংবা সমালোচনা, আপনাদের পাঠ-প্রতিক্রিয়া আমাদের জানাবেন। আপনাদের মতামত আমাদের ভুল সংশোধনের পথ দেখাবে এবং সত্য ও জ্ঞানের প্রচারে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগাবে। পাশাপাশি, আপনার পরিচিত সত্য অনুসন্ধানী ও সচেতন সনাতনীদের কাছেও এই পত্রিকাটি পৌঁছে দিন। আপনাদের সামান্য উদ্যোগেই এই জ্ঞানচর্চার পরিধি আরও বিস্তৃত হতে পারে।

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আপনাদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণেই বৃহত্তর কোন পদক্ষেপ হয়ে উঠতে পারে। আশা করি, সত্যসন্ধানী ও সচেতন সনাতনী সমাজ কখনোই জ্ঞানচর্চার এই ধারাকে থেমে যেতে দেবে না।

মৃগাঙ্ক রায়

সম্পাদক, শাশ্বত সত্য

গবেষক, সনাতন শাস্ত্র গবেষণা কমিটি

সত্যের সন্ধানে সনাতন

সম্পাদকীয় | অভিমত



সম্পাদকমণ্ডলী, এসএসএস-এর সকল সদস্য, সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিক সহযোগিতা ও আশীর্বাদে "শাশ্বত সত্য"-এর দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো। আপনাদের ভালোবাসা, উৎসাহ ও নিরন্তর সহযোগিতার ফলেই এই পথচলা আজ আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পেরেছে।

সত্যকে প্রতিষ্ঠার পথ সহজ নয়। তবুও নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থন আমাদের পথচলার প্রেরণা জোগায়। পূর্বের মতো এবারও ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাসভিত্তিক প্রবন্ধের পাশাপাশি থাকছে কবিতার কলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও সহজ সংস্কৃত শিক্ষার কলাম। জ্ঞান, চিন্তা ও মননের বিকাশে এই ছোট্ট প্রয়াস আপনাদের ভালো লাগবে এবং নতুন কিছু জানার আগ্রহকে আরও সমৃদ্ধ করবে - এই আমাদের প্রত্যাশা।

অনুশ্রী দাস

প্রচারক, শাশ্বত সত্য

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "জ্ঞানযজ্ঞঃ পরং তপ"। "শাশ্বত সত্য" যেন বহু বিদ্বান ও বিজ্ঞজনের সম্মিলিত পরম তপস্যার ন্যায় এক পবিত্র জ্ঞানযজ্ঞ, যেখানে সনাতন ধর্মের নানা দার্শনিক তত্ত্ব, ইতিহাস ও চিন্তাশীল সৃজনশীলতা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই ধারাবাহিকতারই অংশ হিসেবে "শাশ্বত সত্য"-এর দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যাতেও সনাতন ধর্মসম্পর্কিত বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব, ইতিহাস এবং প্রতিভাবানদের নানা সৃজনশীল রচনা স্থান পেয়েছে। "শাশ্বত সত্য"-এর একজন সম্পাদক হিসেবে এই পবিত্র ও জ্ঞানময় যজ্ঞে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত ও সৌভাগ্যবান বোধ করছি।

সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে এই জ্ঞানযজ্ঞ উত্তরোত্তর সার্থক ও সমৃদ্ধ হোক এবং সমাজের মানুষের মেধা, মনন ও জ্ঞানচর্চার বিকাশে সহায়ক হয়ে উঠুক - এই প্রার্থনাই করি শ্রীসর্ববিদ্যেশ্বর ও শ্রীশারদাম্বিকার চরণে।

শ্রী অপূর্ব মোদক চৌধুরী

সহ সম্পাদক, শাশ্বত সত্য

ত্রৈমাসিক

সূচিপত্র

২য় বর্ষ - ৩য় সংখ্যা

জুন-জুলাই-আগস্ট

২০২৬ ইং | ১৪৩৩ বং

সম্পাদক মণ্ডলী

সম্পাদক
মৃগাঙ্ক রায়

সহ সম্পাদক
শ্রী অপূর্ব মোদক চৌধুরী

সংশোধক
পৃথা স্যানাল
অনন্ত দাস
নির্ভীক সরকার
দীপঙ্কর তালুকদার জয়

প্রচারক
স্নেহা গাইন
অনুশ্রী দাস
প্রলয় বণিক

উপদেষ্টা
নিরঞ্জন চন্দ্র দাশ
সাত্যকি দেব

সার্বিক পরিচালনায় ও প্রকাশনায়:
'সত্যের সন্ধানে সনাতন'



ঋগ্বেদোক্ত ব্রহ্মবাদ

শ্রীঅপূর্ব মোদক চৌধুরী

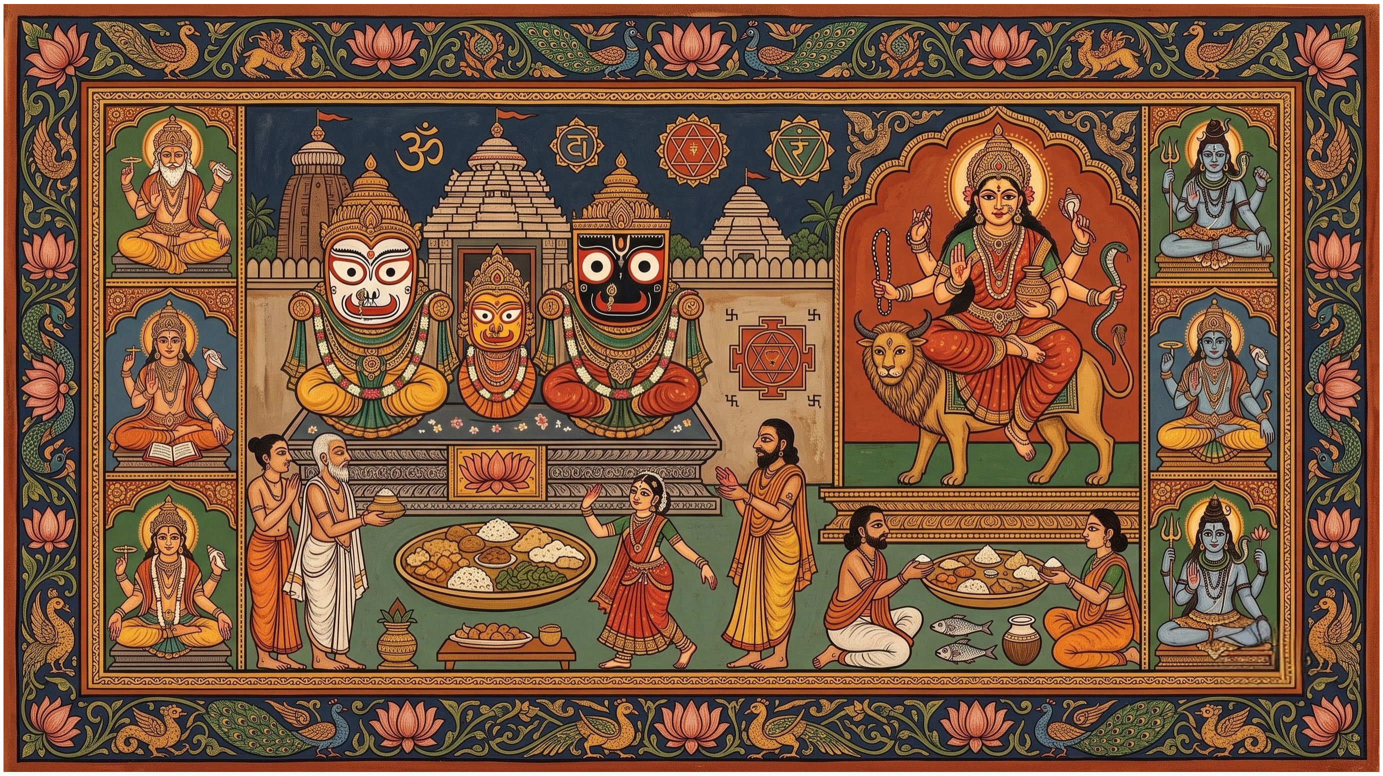
বর্তমানে অনেকেই বেদাদি শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মবাদের উপর প্রশ্নবিদ্ধ করে। যদিও বেদান্ত তথা উপনিষদে ব্রহ্মবাদ সুস্পষ্ট। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে কিছু লোক রয়েছে যারা পূর্ব মীমাংসাকার জৈমিনি ঋষির মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অভিন্ন বেদ, এই তত্ত্বে অবিশ্বাসী। তারা মনে করে ব্রহ্মবাদ বেদান্তে থাকলেও মন্ত্রসংহিতাতে নেই। বিশেষ করে ঋগ্বেদ। কারণ যেহেতু ঋগ্বেদ সমস্ত বেদের মধ্যে প্রাচীন। কিন্তু আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় চেষ্টা করবো যে ব্রহ্মবাদের ধারণা যে আর্য্যজাতির প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্র ঋগ্বেদ থেকেই শুরু তা প্রমাণ করার।
ঋগ্বেদের চতুর্থ মন্ডলের ২৩ নং সূক্তে যে সমস্ত স্বরূপ ঋতসত্য (অবিনাশী সত্তা), প্রথম মন্ডলের ১৬৪ নং সূক্তে যে সদ্বস্তু ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবস্বরূপ এবং বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত যে সনাতন সত্তা হতে ইন্দ্রাদি দেবগণ জাত (৮/২১/১৩, ১০/১১১/৩, ৮/২৫/২) সেই ঋত সত্য সনাতন সত্ত্বাই বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমন্তং ব্রহ্ম (কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২.১.১)।

ঋগ্বেদে (শাকল শাখা, ১/১৬৪/৪৬) উল্লেখ আছে, "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।।" উক্ত ঋকে যে সদ্রূপের কথা উল্লেখ আছে সেই সদ্রূপ মূলত যে ব্রহ্ম তা অস্বীকার করা যাবে না। কারণ শুক্লযজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত (৫.৫.১) "সত্যং ব্রহ্ম", কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদোক্ত (২.১.১) "সত্যং জ্ঞানমন্তং ব্রহ্ম" অথবা সামবেদীয় ছান্দোগ্য

উপনিষদোক্ত (৬.২.১) "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" শ্রুতিতে সদ্রূপকে ব্রহ্ম বলেই উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদোক্ত (৪.৪০.৫) হংসবতী ঋকও ব্রহ্মবিষয়ক এবং বেদান্তবর্ণিত ব্রহ্মের সর্বাত্মকতা সিদ্ধ করে,"হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বররসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্।।" উক্ত মন্ত্র যে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হয়েছে তা মহর্ষি যাস্ক নিরুক্তে (১৪/২৯) উল্লেখ করেছেন। মহর্ষি শৌনকও উক্ত মন্ত্রপাঠে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন (ঋগ্বিধান ২/১৩)। এছাড়াও ঋষি শৌনক যিনি ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মন্ডলের বহু সূক্তের দ্রষ্টা সেই ঋষি শৌনকও তাঁর বৃহদ্দেবতায় লিখেছেন,"ব্রহ্ম বাক ব্রহ্ম সত্যং চ ব্রহ্ম সর্বমিদং জগৎ।" ঋগ্বেদের ২/২৩/৬ মন্ত্রে ভগবান শৌনক ব্রহ্মণস্পতি বলতে ব্রহ্মস্বরূপ বাককেই ব্রহ্মের রক্ষক বলে স্তুতি করেছেন। ব্রহ্মস্বরূপ বাক যে দেবতাদেরও দেবতা তা ঋগ্বেদের ২/২৩/১৭ এ উল্লেখিত হয়েছে।
বিশেষ ভাবে ঋগ্বেদে (১/১৬৪/৩৫) ঋষি দীর্ঘতমা উপলব্ধি করছেন,"ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম - এই ব্রহ্মই (বেদ) বাণীর পরম ব্যোম"। অর্থাৎ বেদোক্ত সদ্রূপ, হংস, ঋত ও ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মই যে বেদের প্রতিপাদ্য তা সিদ্ধ হলো।
এইবার দেখবো বেদে ব্রহ্মবাদের সাথে সামঞ্জস্য কিছু সূক্ত যেখানে ব্রহ্মবাদের অধিকাংশ তত্ত্ব রয়েছে সুস্পষ্ট ভাবে। ঋগ্বেদীয় (শাকল শাখার, দশম মন্ডল) পুরুষসূক্তের সায়ণভাষ্য পড়লে এই বিষয়টা সুস্পষ্ট ভাবে বলাই যায় যে ব্রহ্মবাদের মূল এই ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত। ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের সকল ঋকই বেদান্তোক্ত ব্রহ্মবাদের মেরুদন্ড। ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে "ত্রিপাৎ পুরুষঃ" এর অর্থ সায়ণ করেছেন "সংসাররহিত ব্রহ্মস্বরূপঃ"। ঋগ্বেদীয় মুদ্গালোপনিষদ মতেও পুরুষসূক্তের পুরুষ পরব্রহ্মই। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ, ব্রহ্মসর্বাতীতবাদ এবং ব্রহ্ম যে স্বীয় স্বরূপ অবিকৃত রেখে জগৎ হয়েছে ইত্যাদি ব্রহ্মবাদের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ বিষয় পুরুষ সূক্তের মধ্যেই বিরাজমান। ঋগ্বেদোক্ত পতঙ্গসূক্ত বা মায়াসূক্তেও (দশম মন্ডল, ১৭৭নং সূক্ত) অদ্বৈতবেদান্তের অন্তর্ভুক্ত বিষয় যেমন মায়াবাদ ও জীবব্রহ্মৈক্য প্রতিপাদিত হয়েছে। এছাড়াও নাসদীয় সূক্ত ও দেবীসূক্তও অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তের কথা বলে। অর্থাৎ, বেদান্তোক্ত ব্রহ্মবাদের সকল বিষয়বস্তু প্রথম পর্যায় থেকেই যে আর্য্যজাতির চিন্তাধারায় বিদ্যমান ছিল তা ঋগ্বেদেই রয়েছে। অর্থাৎ, সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" শ্রুতি যেমন "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" ঋক প্রভাবিত ঠিক একইভাবে ব্রহ্মবাদের সকল বিষয়বস্তু ঋগ্বেদ থেকেই শুরু। যা উপনিষদাদি বেদান্ত শাস্ত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাই বেদান্তোক্ত ব্রহ্মবাদের সূচনা যে ঋগ্বেদ থেকেই তা প্রমাণিত হলো।

তথ্যসূত্র:

১) অদ্বৈতবাদ - কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী
২) অদ্বৈতবাদের প্রাচীন কাহিনী - স্বামী বিদ্যারণ্য
৩) যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ - শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত



শ্রীক্ষেত্র পুরীর প্রভু জগন্নাথঃ
বৈষ্ণব,তন্ত্রঃ,শাক্ত ও শিব মতের এক মহাসম্মিলন

শ্রী সুকান্ত চক্রবর্তী

'দ্য জগন্নাথ টেম্পল অ্যাট পুরী' গ্রন্থের লেখক গবেষক স্টারজার মতে, প্রাচীনকালে জগন্নাথ মন্দির ছিল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব–এই ত্রিমূর্তি পূজার কেন্দ্র। ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব ঈশ্বরের সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ -- এই তিনটি গুণের প্রতীক। ঈশ্বরের ক্রিয়াময়রূপকে শক্তি বলা হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব - ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ রূপের শক্তি যথাক্রমে সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পার্বতীও (বিমলার মূর্তিতে) এখানে পূজিত হতেন। তন্ত্র মতে আদ্যাশক্তি দেবী বিমলার ভৈরব হলেন জগন্নাথ। এখন শাক্ত মত অনুযায়ী আদ্যাশক্তির ভৈরব আসলে শিব তাই শাক্ত মতে জগন্নাথকে বিষ্ণুর রূপ মনে করা হয় না। এই মতে তিনি শ্রীবিদ্যা দেবী বিমলার ভৈরব অর্থাৎ শিব। তন্ত্রগ্রন্থ কুব্জিকাতন্ত্র মতে, জগন্নাথ ধাম তান্ত্রিক সাধনার ৪২টি সিদ্ধপীঠের অন্যতম দেবীভাগবত পুরাণ, প্রাণতোষিণী তন্ত্র ও বৃহন্নীলতন্ত্র বিমলা মন্দিরকে ১০৮ পীঠের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছে। মৎস্যপুরাণ মতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা নীলাচলের পীঠশক্তি হিসাবে দেবী বিমলার (ভগবতীর একটি বিশেষ রূপ) নামের উল্লেখ করা হয়েছে। মহাপীঠ নিরুপণ গ্রন্থেও বিমলা ও জগন্নাথকে পীঠদেবতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবীর ১০৮টি পৌরাণিক নামের তালিকা নামাষ্টোত্তরশত গ্রন্থে আদ্যাশক্তি ভগবতী বিমলার নাম পাওয়া যায়। আদি শঙ্করাচার্য দেবী বিমলাকে প্রধান দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে পুরীতে গোবর্ধন মঠ স্থাপন করেছেন। আজও এই মঠে শঙ্করাচার্যের নির্দেশে আদ্যাশক্তি দেবী বিমলা এবং ভৈরব বা শিব হিসাবে জগন্নাথের উপাসনা করা হয় ।

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত জগন্নাথ মন্দির শৈব ও শাক্ত শ্রীবিদ্যা-উপাসকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় বৈষ্ণবধর্ম এই মন্দির চত্বরে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং শৈব ও শাক্তদের প্রভাব কমে যায়। তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থের "**পীঠনির্ণয়**" বা "**মহাপীঠনির্ণয়**" অংশে নীলাচলকে 'শক্তিপীঠ' বলা হয়েছে।

এই পীঠের প্রধান দেবী বিমলা ও ভৈরব জগন্নাথ। মন্দিরটির অবস্থান হিসেবে **'নীলাচল'** নামটির উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, নীলাচল হল জগন্নাথ মন্দির চত্বরের প্রথাগত নাম। শিবচরিত গ্রন্থেও নীলাচলকে উপপীঠ এবং এই পীঠের দেবী বিমলা ও ভৈরব জগন্নাথ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জগন্নাথ মন্দির চত্বরের ভিতরেই দেবী বিমলার মন্দিরটি আজও এখানে আছে এবং তন্ত্র মতেই এখানে দেবী বিমলার উপাসনা হয়। তান্ত্রিক পুজোয় মাছ মাংস ভোগ দেবার বিধি আছে।

কষ্টিপাথরের নির্মিত দেবী বিমলা চর্তূভূজা, দক্ষিণের নীচের হাতে অক্ষমালা, উপরের হাতে অমৃতকলস,বামদিকে উপর হাতে নাগকন্যা, নিম্নহাতে অভয় বরমূদ্রা ধারণী। পার্শদেবীরূপে মহিষমর্দিনী দুর্গা ও চামুন্ডা অধিষ্ঠিত। এই মন্দিরের দুপাশে আছে পাথরের দুটি মূর্তি ছায়া ও মায়া। দেবীর পূজা হয় তন্ত্রমতে, পঞ্চমকারে। ধ্যানমন্ত্র - দেবী চন্ডীর ধ্যান। তবে পঞ্চ-ম-কারের অনুকল্প ব্যবহৃত হয়। মৎস্য হিং দিয়ে রান্না করা শাক, মাংস, আদা কুচি। মদ্য-কাসার পাত্রে ডাবের জল। মুদ্রা-জলে গোলা ময়দা আর চিনি। মৈথুন-রক্ত চন্দনে মাখা অপরাজিতা পুষ্প দ্বারা সেবানৃত্য করেন নয় বছর বয়স্ক অসূর্য্যস্পর্শা দেবদাসীগণ।

প্রধানা সর্বশক্তিনাং বলা বলবতী পরা।
সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা যোগরূপিনী।।

মা এখানে সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী। রাজা নরসিংহদেব (শাসনকাল ১৬৩২–৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) মন্দিরে মাছ ও মাংস ভোগের প্রথা নিষিদ্ধ করে দিলেও এবং পরবর্তী কালে জগন্নাথ মন্দিরে বৈষ্ণব প্রভাব বিস্তারলাভ করলেও আজও শাক্ত মত অনুযায়ী আমিষ ভোগের প্রথা চলে আসছে। আজও বিশেষ বিশেষ তিথি-তে তন্ত্রোক্ত মতে দেবী বিমলাকে মাছ ও মাংস ভোগ দেওয়া হয় । সুতরাং শাক্ত ও শৈব দৃষ্টিতে জগন্নাথ হলেন আদ্যাশক্তি দেবী বিমলার ভৈরব বা শিব। আবার বৈষ্ণবরা মনে করেন জগন্নাথ হলেন স্বয়ং বিষ্ণু। পীঠনির্ণয় তন্ত্রে বলা হয়েছে -

উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরাজক্ষেত্রমুচ্চতে।
বিমলা সা মহাদেবী ,জগন্নাথস্তু ভৈরব।।

অর্থঃউৎকলে দেবীর নাভিদেশ পড়েছিলো,দেবীর নাম বিমলা,ভৈরব জগন্নাথ।

যদিও অনেকের মতে কটকের যাজপুর হলো বিমলা ক্ষেত্র। তবে সাধারণত এই জগন্নাথ ক্ষেত্রের বিমলা দেবীকেই শক্তিপীঠ বলে ধরা হয়। অন্যদিকে, মহানির্বাণ তন্ত্র মতে,

উগ্রতারা শূলপাণি সুভদ্রা ভুবনেশ্বরী।
নীলাদ্রৌ তু সাক্ষাৎ জগন্নাথ দক্ষিনাকালিকা।।

(উগ্রতারা শূলপাণি সুভদ্রা ভুবনেশ্বরী।
নীলাদ্রৌ তু সাক্ষাত্ জগন্নাথ দক্ষিণাকালিকা।।)

অর্থ - শূলপাণি সদাশিবস্বরূপ বলভদ্র সাক্ষাৎ দেবী উগ্রতারা, সুভদ্রা মায়াবীজাধিষ্ঠাত্রী দেবী ভুবনেশ্বরী এবং নীলাদ্রিক্ষেত্রে অবস্থিত জগন্নাথ স্বয়ং পরব্রহ্মস্বরূপ নির্গুণ শূণ্যরূপা দক্ষিণাকালী।
শাক্তদের কাছে দক্ষিণাকালী, ব্রহ্মবাদীদের কাছে দারুব্রহ্ম, বৈষ্ণবদের কাছে গোলকবিহারী, তন্ত্রসাধকের কাছে ভৈরব—বিভিন্ন সময়ে নানান নামে নানান উপাচারে পূজিত হয়েছেন তিনি, এখনও হন। তাই তাঁর পূজামন্ত্রে আছে সমস্ত ধর্মের অনুষঙ্গ, পূজায় নানান ধর্মের আচার। এভাবেই একইরূপে একইসঙ্গে নানান ধর্মের মানুষের নাথ হয়ে উঠেছেন জগন্নাথ।

এবারে যদি একত্রীভূত করে দেখি, তাহলে দেখব, জগন্নাথ কোনো নির্দিষ্ট গোত্রের দেবতা নন।
তিনি একাধারে মহাবিষ্ণু, যিনি গর্ভগৃহের রত্নবেদীতে বসে আছেন দক্ষিণকালিকা যন্ত্রের ওপরে, কামবীজে পূজিত হচ্ছেন, আবার ভৈরব মন্ত্রেও পূজিত হচ্ছেন।
সাধারণক্ষেত্রে মহালক্ষ্মী তাঁর শক্তি হলেও, বিশেষ মতবাদে বিমলারূপিনী দুর্গা তাঁর শক্তি। একাধারে জগন্নাথ বৈষ্ণব, শাক্ত এবং শৈব দেবতাদের সংমিশ্রিত রূপ। শুধু তাই বা বলি কেন, জগন্নাথ স্নানবেদীতে মহাগণপতি,

শয়নে মহাবিষ্ণু, গমনে মার্তন্ড ভৈরবরূপী সূর্য, ভোজনে মহাভৈরবরূপে রুদ্র এবং শ্রীমন্দিরের গর্ভগৃহের রত্নবেদিকায় প্রথমা মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকারূপে সদাসর্বদা অধিষ্ঠান করছেন।
শুধু শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা নয়, মূর্তিতত্ত্বে যদি ফিরে আসি, খেয়াল করলে দেখতে পাব, দিব্য ত্রিমূর্তির উপরিভাগ মানবীর বক্ষস্থলের (Chest Wall) আকৃতি বিশিষ্ট এবং নিম্নভাগ জরায়ুর দেহভাগের মত(Body of Uterus, Uterine corpus)।

জগন্নাথের সুবর্তুল নেত্রদ্বয় পূর্ণগর্ভা নারীর স্তনযুগলের মত এবং পরিপূর্ণ জরায়ু সেই সৃষ্টিকর্ত্রীর বিশ্বচরাচর প্রসবের ধারণাকেই সুসংগঠিত করে। Fertility Cult ভিন্ন আর কিছু নয়। জগন্নাথ বিমলা দেবীর ভৈরব হয়েও তাঁর দেহাঙ্গ ভিন্ন অন্য কিছু নন এবং দুইতে সম্মিলিত না হলে সৃষ্টিকর্ত্রীর পরিপূর্ণ অবয়ব আসে না।
মহাভৈরব জগন্নাথের প্রতি নিবেদিত প্রসাদ যতক্ষণ না মহাভৈরবী বিমলা দেবীকে উৎসর্গ না করা হয়, ততক্ষণ তা 'মহাপ্রসাদ' হিসেবে গণ্য হয় না। তাই আজ প্রসাদের থালায় তুলসী ও জবার একত্রে অধিষ্ঠান : 'মহাপ্রসাদ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

পরিশেষে চক্রআঁখি মহাপ্রভু-মহাভৈরব-মহাদেবী জগন্নাথের উদ্দেশে বারংবার প্রণাম করে বলি,
"সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমারি দুখানি নয়নে"

নীলাচলনিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ।।



মূর্তিপূজা, দয়ানন্দ ও আর্যসমাজ

শচীন্দ্র শর্মা

দয়ানন্দীদের মতে দেবতাদের মূর্তিগুলি কেবলই পাথর। এগুলিতে কোনো দেবত্ব নেই, কোনো বিশেষত্ব নেই। সেগুলির সামনে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা কুসংস্কার, তাদের প্রণাম করা বোকামি।
কিন্তু যেইমাত্র কোনো পাথর দয়ানন্দের আকার ধারণ করে তা 'সত্য'-র মূর্তিতে পরিণত হয় এবং তার সামনে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ করা বৈদিক হয়ে যায়।
এদের মতে দেবতাদের মূর্তি হলো কুসংস্কার আর দয়ানন্দের মূর্তি হলো প্রেরণা। দেবতাদের মূর্তির সামনে হাত জোড় করা অজ্ঞানতা আর দয়ানন্দের মূর্তির সামনে হাত জোড় করা হলো জাগৃতি।
কী অদ্ভুত এক দ্বিমুখী নীতি!
দয়ানন্দের প্রতিটি মূর্তি হলো আর্য সমাজ কর্তৃক দয়ানন্দের মুখের ওপর সজোরে মারা এক থাপ্পড়। এই মূর্তির প্রতি প্রদর্শিত শ্রদ্ধা আসলে দয়ানন্দকে গালি দেওয়ারই সমান। হাত জোড় করা, ফুল চড়ানো, প্রদীপ জ্বালানো– এসব তো যেন খোদ দয়ানন্দীদের দ্বারাই স্বামীজির প্রতি লাথি-ঘুষি মেরে পুজো করার মতো।
দয়ানন্দের মধ্যে এতটুকু জ্ঞান ছিল যে, তিনি জানতেন ভবিষ্যতে এই বোকা দয়ানন্দীরা তাঁর মূর্তি বানিয়ে পুজো করতে শুরু করবে। এই কারণেই তিনি শুধু মূর্তিই নয়, নিজের ছবি আঁকা এবং টাঙানোরও নিষেধ করে গেছেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছিলেন– "আর্য সমাজের মন্দিরগুলিতে আমার ছবি টাঙিও না।"
কিন্তু দয়ানন্দীরা তাঁদের প্রতিটি জায়গা দয়ানন্দের ছবি ও মূর্তিতে ভরিয়ে ফেলেছেন।
দয়ানন্দের প্রতিটি মূর্তি হলো দয়ানন্দ এবং তাঁর মতাদর্শের পরাজয় এবং সনাতন ধর্মের মতাদর্শের বিজয়।
অদৃশ্য ও অমূর্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের সবচেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক মাধ্যম হলো তার কোনো দৃশ্যমান, মূর্ত প্রতীক আর এটাই হলো মূর্তি-পুজো।



সুশ্রুত সংহিতা ও প্লাস্টিক সার্জারির প্রাচীন ভিত্তি

পৃথা সান্যাল

চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। আজ বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক সার্জারি, পুনর্গঠনমূলক অস্ত্রোপচার (Reconstructive Surgery) এবং মানব ব্যবচ্ছেদের (Anatomical Dissection) যে নিখুঁত চর্চা দেখা যায়, তার প্রাথমিক ও সুসংগঠিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির রূপরেখা আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল ভারতীয় ভূখণ্ডে। এই যুগান্তকারী বিপ্লবের মূল কাণ্ডারী ছিলেন মহর্ষি সুশ্রুত। তাঁর অমর সৃষ্টি 'সুশ্রুত সংহিতা' প্রাচীন আয়ুর্বেদ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং সমগ্র বিশ্ব শল্যচিকিৎসার ইতিহাসের প্রাচীনতম, সুসংগঠিত ও প্রামাণ্য চিকিৎসাগ্রন্থগুলোর একটি। সমসাময়িক চিকিৎসা-ইতিহাসবিদ, গবেষক ও শল্যচিকিৎসকদের মূল্যায়নে সুশ্রুতের শল্যচিকিৎসা-সংক্রান্ত নীতি, অস্ত্রোপচার পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকাশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারি, পুনর্গঠনমূলক শল্যচিকিৎসা এবং অ্যানেস্থেশিয়া-পূর্ব অস্ত্রোপচারের ইতিহাসে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃত। এই কারণেই তাঁকে বিশ্বজুড়ে “Father of Plastic Surgery”, “Father of Indian Surgery” এবং অনেক গবেষকের মতে “Father of Indian Surgery and Ophthalmology” হিসেবে সম্মানিত করা হয়।

মহর্ষি সুশ্রুত আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে প্রাচীন ভারতের কাশী (বর্তমান বারাণসী) অঞ্চলে বসবাস করতেন। তবে তাঁর সঠিক জীবনকাল সম্পর্কে ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মধ্যে এখনো মতভেদ রয়েছে। প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থসমূহে তিনি বৈদিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রের বংশধর এবং প্রখ্যাত ধন্বন্তরীর শিষ্য ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎকালীন বৈদিক সমাজে একদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ আঘাত এবং অন্যদিকে অপরাধ বা সামাজিক দণ্ডের সাজা হিসেবে মানুষের নাক, কান বা ঠোঁট কেটে ফেলার মতো অত্যন্ত নির্মম প্রথা প্রচলিত ছিল।

অঙ্গহানি হওয়া এই বিপুলসংখ্যক মানুষকে পুনর্বাসিত করা, তাঁদের শারীরিক বিকৃতি দূর করা এবং স্বাভাবিক মানবজীবনে ফিরিয়ে দেওয়ার তাগিদ থেকেই সুশ্রুত শল্যচিকিৎসাকে আয়ুর্বেদের অন্যান্য শাখা থেকে আলাদা করে এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের রূপ দেন। প্রাচীন ভারতে যে সময়ে মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করা সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে সীমিত ছিল, তখন সুশ্রুত পর্যবেক্ষণভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শল্যচিকিৎসাকে মানবসেবার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন।

সুশ্রুত সংহিতা কেবল একটি একক চিকিৎসাগ্রন্থ নয়, বরং এটি শল্যচিকিৎসা, শারীরবিদ্যা, রোগনির্ণয় এবং ঔষধিবিজ্ঞানের এক সুবিন্যস্ত বিশ্বকোষ। সমগ্র গ্রন্থটি মোট ১৮৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মূল অংশ পাঁচটি স্থানে (স্থান) বিভক্ত– সূত্রস্থান, নিদানস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসাস্থান এবং কল্পস্থান। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে ‘উত্তরতন্ত্র’ নামক একটি সম্পূরক অংশ সংযোজিত হয়, যেখানে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, কণ্ঠ, শিরোরোগ এবং শিশুস্বাস্থ্য ও শিশুচিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

সুশ্রুত সংহিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর বাস্তবমুখী, পর্যবেক্ষণনির্ভর ও ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি। গ্রন্থটিতে প্রায় ১,১২০টি রোগ, ৭০০টি ঔষধি উদ্ভিদ, ৬৪টি খনিজ উৎস এবং ৫৭টি প্রাণীজ উৎসের চিকিৎসায় ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য হলো, এতে চিকিৎসাশাস্ত্রকে কেবল



উপশমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শল্যচিকিৎসা বা ‘শল্যতন্ত্র’-কে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সুশ্রুতের মতে, যেখানে ভেষজ চিকিৎসা পর্যাপ্ত নয়, সেখানে শল্যচিকিৎসাই রোগ নিরাময়ের কার্যকর উপায়।

সুশ্রুতকে প্লাস্টিক সার্জারির জনক বলার পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ ও সুসংহত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। গ্রীক বা অন্য কোনো প্রাচীন সভ্যতায় যখন বাহ্যিক ক্ষতের সাধারণ প্রলেপ দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় জানা ছিল না, তখন সুশ্রুত মানবদেহের এক অংশের জীবিত টিস্যু বা চর্ম কেটে এনে অন্য অংশে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করার কৌশল প্রবর্তন করেন।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, যখন আধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র, আধুনিক অ্যানাস্থেসিয়া বা কৃত্রিম অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তখন তিনি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে কান, ঠোঁট এবং নাকের পুনর্গঠন পদ্ধতি বা প্লাস্টিক সার্জারির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, মানবদেহের ক্ষতিগ্রস্ত কলা বা টিস্যুকে সঠিক উপায়ে রক্ত সংবহন বজায় রেখে স্থানান্তর করলে তা নতুন স্থানে সম্পূর্ণ নতুন টিস্যুর মতো জুড়ে যায়। টিস্যু প্রতিস্থাপনের এই মৌলিক নীতিই আজ বিশ্বের সমস্ত পুনর্গঠনমূলক প্লাস্টিক সার্জারির মূল চালিকাশক্তি।

সুশ্রুত সংহিতায় বর্ণিত সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অস্ত্রোপচার হলো 'পেডিকল ফ্ল্যাপ রাইনোপ্লাস্টি' বা নাকের পুনর্গঠন পদ্ধতি। তৎকালীন সময়ে যুদ্ধে বা রাজদণ্ডে নাক কেটে যাওয়া রোগীর নতুন নাক তৈরির জন্য সুশ্রুত রোগীর নিজের কপাল বা গাল থেকে চামড়া কেটে এনে ব্যবহার করতেন। এই পদ্ধতিটির প্রতিটি ধাপ ছিল আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিয়মে সাজানো।

চিকিৎসার সূচনা হতো রোগীর কাটা নাকের সুনির্দিষ্ট পরিমাপের মাধ্যমে, যার জন্য একটি বিশেষ গাছের পাতা ব্যবহার করা হতো। এরপর সেই পাতাটির মাপে রোগীর কপাল বা গাল থেকে চামড়ার একাংশ কেটে নেওয়া হতো। তবে সুশ্রুতের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ছিল চামড়াটির এক প্রান্ত মূল কপালেই যুক্ত রাখা, যাতে কপাল থেকে আসার পর টিস্যুটিতে রক্ত প্রবাহ বা রক্ত সংবহন সচল থাকে। আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারিতে এই যুক্ত থাকা চামড়ার অংশটিকে বলা হয় 'পেডিকল' (Pedicle) এবং এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় 'পেডিকল ফ্ল্যাপ মেথড'।

এরপর মূল নাকের ক্ষতস্থানটির ধারগুলো সামান্য চেঁচে তা থেকে তাজা রক্ত বের করা হতো, যাতে নতুন বসানো কপাল থেকে আনা চামড়াটি সহজেই সংলগ্ন টিস্যুর সাথে মিশে যেতে পারে। কপাল থেকে নামিয়ে আনা চামড়াটিকে নাকের আকৃতি দিয়ে অতি সূক্ষ্ম সুতো দ্বারা সেলাই করে বসানো হতো। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে নতুন তৈরি নাকের দুটি ছিদ্রে এরণ্ড গাছের নল (Eranda tubes) বসিয়ে দেওয়া হতো। অস্ত্রোপচার শেষে সংক্রমণ রোধে মধু, ঘি, তিল এবং যষ্টিমধুর বিশেষ প্রলেপ প্রয়োগ করা হতো। কিছু দিন পর টিস্যু পুরোপুরি মূল নাকের সাথে জুড়ে গিয়ে নিজস্ব রক্তসঞ্চালন শুরু করলে কপাল ও নাকের মধ্যবর্তী বাড়তি সংযোগকারী চামড়াটি কেটে পৃথক করে দেওয়া হতো।

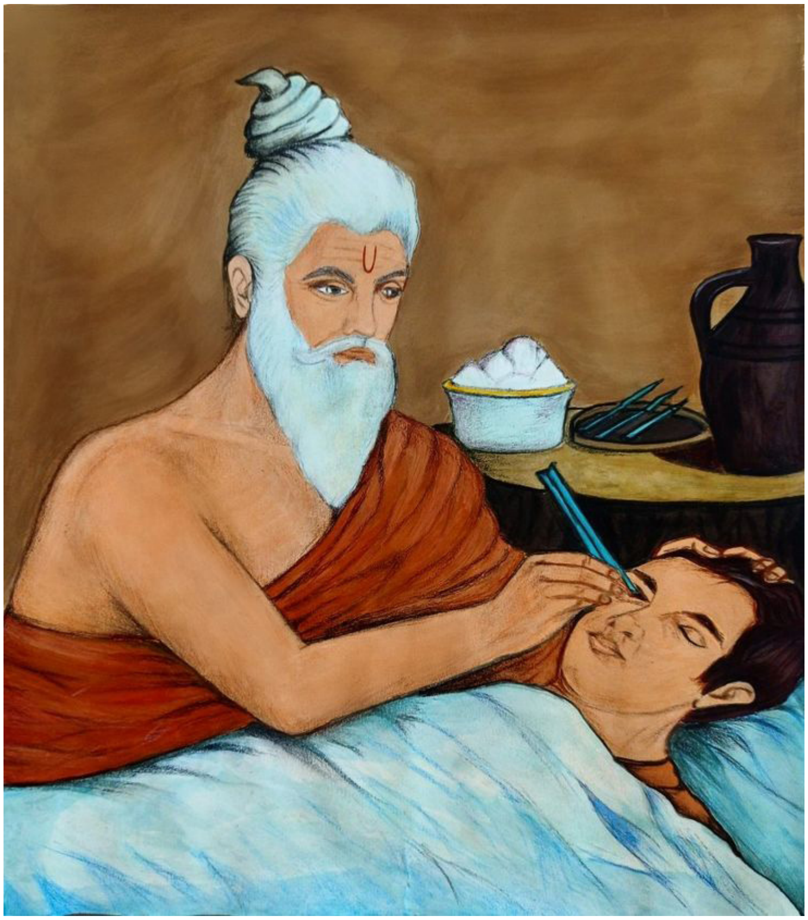
অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ইংরেজ চিকিৎসকরা ভারতে এসে পুনে অঞ্চলে এক কাঠুরের নাক ভারতীয় এই আদি পদ্ধতিতে পুনর্গঠন হতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। ১৭৯৪ সালে 'দ্য জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিন'-এ এর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপীয় চিকিৎসকরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করা শুরু করেন, যা বিশ্ব চিকিৎসা ইতিহাসে 'ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাপ মেথড' (Indian Flap Method) হিসেবে নতুন বিপ্লব ঘটায়।

সুশ্রুত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, একজন চিকিৎসকের কাছে তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান বা অ্যানাটমি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান না থাকলে শল্যচিকিৎসা করা অসম্ভব। এই কারণে তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের জন্য মানবদেহের অঙ্গব্যবচ্ছেদ বা ডিসেকশনের এক অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন।

তৎকালীন সময়ে ফরমালিন বা রাসায়নিক উপাদান না থাকায় মৃতদেহ দীর্ঘদিন তাজা রাখা অসম্ভব ছিল। এই বাধা অতিক্রম করতে সুশ্রুত এক অভিনব প্রাকৃতিক উপায় প্রবর্তন করেন। প্রথমে এমন এক মৃতদেহ নির্বাচন করা হতো, যা বৃদ্ধ বয়সে স্বাভাবিক কারণে মারা গেছে এবং যার দেহে কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগ, বাহ্যিক ক্ষত বা বিষক্রিয়ার লক্ষণ নেই। মৃতদেহের অভ্যন্তরীণ পাকস্থলী ও অন্ত্রের বর্জ্য পরিষ্কার করে তা ঘাস, বাঁশের শক্ত ছাল বা পাট দিয়ে অত্যন্ত শক্তভাবে পেঁচিয়ে একটি খাঁচায় ভরা হতো।

এরপর সেই মুড়ে রাখা দেহটিকে নির্জন ও ধীরগতির নদীর তলদেশে এক সপ্তাহের জন্য ডুবিয়ে রাখা হতো। সাতদিন জলের প্রাকৃতিক প্রভাবে মৃতদেহের উপরিভাগের ত্বক ও মেদ নরম হয়ে আলগা হয়ে যেত। এক সপ্তাহ পর দেহটি নদী থেকে তুলে এনে সুশ্রুতের তদারকিতে শিক্ষার্থীরা ধাতব ছুরি ব্যবহার না করে বাঁশের ছাল, শক্ত ঘাসের মূল বা বিশেষ ব্রাশের সাহায্যে আলতোভাবে ঘষে ঘষে উপরিভাগের ত্বক ও টিস্যু সরিয়ে দিতেন। ছুরি ব্যবহার না করার উদ্দেশ্য ছিল ভেতরের সূক্ষ্ম ধমনী, শিরা, স্নায়ু, পেশী এবং অস্থিসন্ধিগুলো যাতে কেটে নষ্ট না হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা স্বচক্ষে শরীরের গভীরতম স্তর ও অঙ্গসংস্থান পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেতেন।

সুশ্রুত কেবল অস্ত্রোপচারের পদ্ধতিই তৈরি করেননি, বরং এর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষণের এক বিশাল রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। সুশ্রুত সংহিতায় মোট ১২১ থেকে ১২৫টি ভিন্ন ভিন্ন শল্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলোকে প্রধানত দুটিভাগে ভাগ করা হয়েছে— 'যন্ত্র' (Blunt Instruments বা ভোঁতা সরঞ্জাম, যেমন সাঁড়াশি বা চিমটা) এবং 'শাস্ত্র' (Sharp Instruments বা ধারালো সরঞ্জাম, যেমন ছুরি বা কাঁচি)।



তিনি এই যন্ত্রগুলোকে সিংহের মুখ, বকের ঠোঁট, কুমিরের মুখ বা বিভিন্ন পাখির ঠোঁটের আকৃতিতে তৈরি করেছিলেন, যাতে শরীরের নির্দিষ্ট গভীর থেকে সহজে কোনো বস্তু বের করে আনা যায় বা চামড়া ধরে রাখা যায়। এই সমস্ত সরঞ্জাম ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের লোহা বা ইস্পাতের তৈরি।

শিক্ষার্থীদের সরাসরি জীবিত মানুষের ওপর অস্ত্রোপচার করতে দেওয়ার আগে সুশ্রুত কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং বা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। ফলমূলের নরম ত্বকে আঁচড় কেটে চামড়া কাটার অনুশীলন, শসা বা লাউ কেটে টিস্যু কাটার চর্চা, চামড়ার তৈরি পশমে জল ভরা ব্যাগে ছিদ্র করে পুঁজ বের করার শিক্ষা এবং মৃত পশুর চামড়া সেলাই করে সুতো ব্যবহারের নিখুঁত দক্ষতা অর্জন করতে হতো শিক্ষার্থীদের।

আধুনিক শল্যচিকিৎসায় জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization) এবং ব্যথানাশক প্রথার যে গুরুত্ব রয়েছে, সুশ্রুত হাজার বছর আগেই তা উপলব্ধি করেছিলেন। অস্ত্রোপচার কক্ষ এবং সমস্ত শল্যযন্ত্র ব্যবহার করার পূর্বে তিনি ধূপ, নিমপাতা, গুগগুলু এবং বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের ধোঁয়া দিয়ে বাতাস ও সরঞ্জাম পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতেন।

রোগীর অস্ত্রোপচারকালীন অসহ্য যন্ত্রণা কমানোর জন্য সুশ্রুত রোগীকে বিশেষ মাত্রায় শক্তিশালী মদ্যপান বা ভেষজ নির্যাস প্রয়োগ করতেন, যা স্নায়ুতন্ত্রকে সাময়িকভাবে অবশ করে রাখত। এটিই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রাক-অ্যানেস্থেশিয়া বা প্রাথমিক অবচেতন ব্যবস্থার প্রাচীনতম উদাহরণ।

অস্ত্রোপচার শেষ হওয়ার পর রক্তপাত বন্ধ করতে তিনি ক্ষার প্রয়োগ, অগ্নিদগ্ধকরণ (Cauterization) বা বিশেষ ভেষজ প্রলেপ ব্যবহার করতেন। ক্ষতস্থানে ইনফেকশন বা পচন প্রতিরোধ করতে মধু ও ঘি মিশ্রিত পরিষ্কার সুতির কাপড়ের ব্যান্ডেজ বাঁধার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছিল, যা ক্ষত দ্রুত নিরাময়ে সাহায্য করত।

সুশ্রুতের এই কালজয়ী চিকিৎসা জ্ঞান কেবল ভারতের ভৌগোলিক সীমানায় আটকে থাকেনি। খলিফা হারুন আল-রশিদের রাজত্বকালে অষ্টম শতকে বাগদাদে ভারতীয় বহু আয়ুর্বেদ গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। প্রখ্যাত আরব অনুবাদক ইবনে ধন 'সুশ্রুত সংহিতা'-কে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন, যা মধ্যপ্রাচ্যে 'কিতাব সুশ্রুদ' (Kitab-i-Susrud) নামে খ্যাতি লাভ করে।

পরবর্তীতে এই আরবি অনুবাদ ও ইসলামি স্বর্ণযুগের চিকিৎসা নথির মাধ্যমে সুশ্রুতের নীতি ও শল্যচিকিৎসার ধারণাগুলো উত্তর আফ্রিকা হয়ে ইউরোপের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছে যায়। রেনেসাঁস যুগে ইউরোপীয় শল্যচিকিৎসকরা সুশ্রুতের টিস্যু প্রতিস্থাপন ও শল্যযন্ত্রের নকশা থেকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যা পাশ্চাত্য শল্যচিকিৎসার উন্নয়নে পরোক্ষ কিন্তু গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে বিচার করলে সুশ্রুতের চিন্তাধারা বিস্ময়করভাবে প্রাগ্রসর ও প্রাক-আধুনিক। তাঁর পেডিকল ফ্ল্যাপ রাইনোপ্লাস্টি আজকের প্লাস্টিক সার্জারির স্বীকৃত ভিত্তি। তবে প্রাচীন যুগের সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁর কিছু ধারণায় প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর অতি-নির্ভরশীলতা ছিল।

আধুনিক মাইক্রো-সার্জারি, জীবাণু তত্ত্ব (Germ Theory) এবং রাসায়নিক অ্যানেস্থেশিয়ার আধুনিকতার পাশে

সুশ্রুতের যুগের কিছু প্রক্রিয়া প্রাথমিক মনে হতে পারে। এ ছাড়া, তৎকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে সুশ্রুতের কাজ দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ব দরবারে সরাসরি ভারতীয় নামানুসারে স্বীকৃতি পায়নি; বরং ইউরোপীয় চিকিৎসার মাধ্যমে নতুনভাবে প্রচারিত হয়েছিল। তবে এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর মৌলিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও শারীরিক ব্যবচ্ছেদের শিক্ষা আজ বিশ্বজুড়ে সমানভাবে শ্রদ্ধেয়।

সুশ্রুত সংহিতায় চিকিৎসকের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতার সমন্বয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই সম্পর্কে সূত্রস্থানে অত্যন্ত সুন্দর একটি শ্লোক রয়েছে:

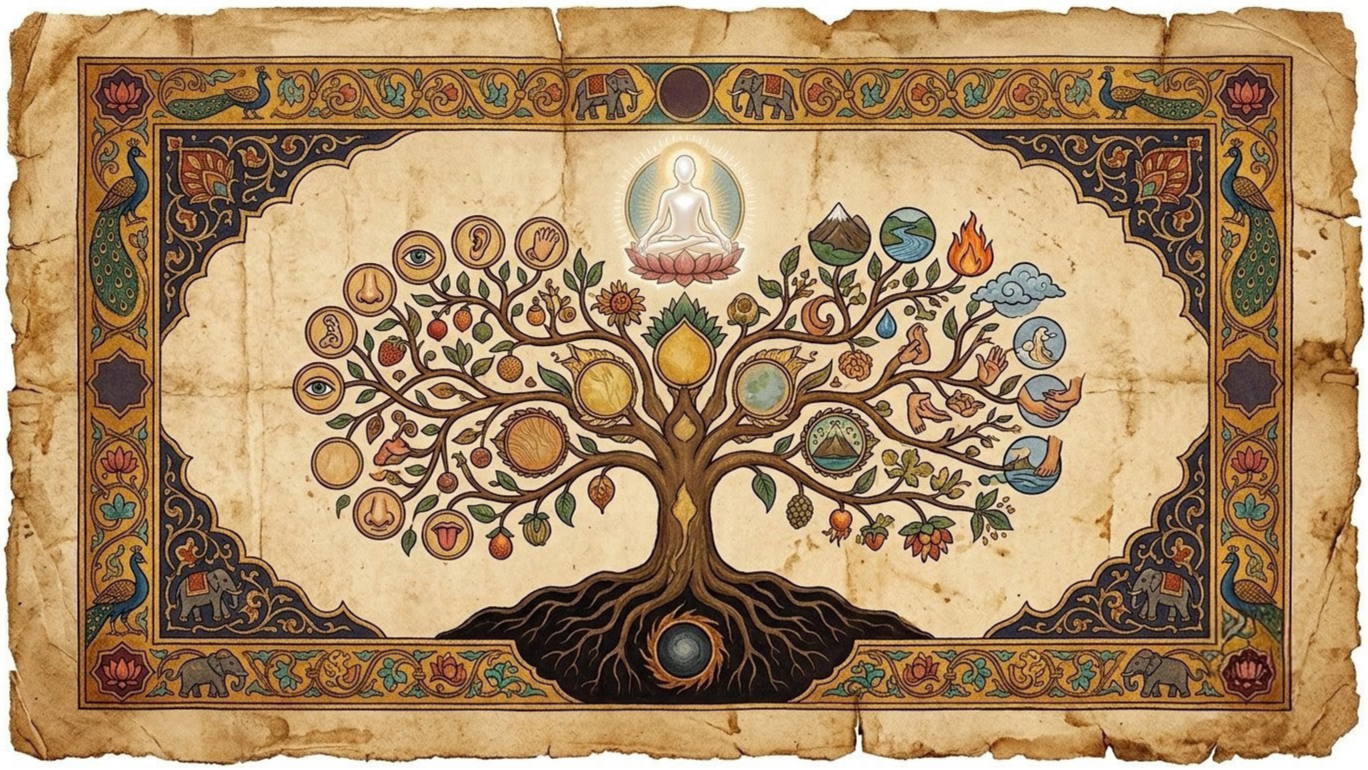
যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞো কর্মস্বপরিনিষ্ঠিতঃ।
স মুহূর্তং ন তিষ্ঠেৎ সংগ্রামে শূরমানীব॥

ভাবার্থ: যে ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রজ্ঞানে পারদর্শী কিন্তু ব্যবহারিক বা শল্যকর্মে অনভিজ্ঞ, সে যুদ্ধক্ষেত্রে অদক্ষ যোদ্ধার ন্যায় বাস্তব পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ, একজন প্রকৃত শল্যচিকিৎসকের জন্য শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা উভয়ই অপরিহার্য।

সুশ্রুত সংহিতা কেবল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের নিদর্শন নয়, এটি সমগ্র মানব সভ্যতার শল্যচিকিৎসার প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর। সুশ্রুত তাঁর প্রজ্ঞা, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আড়াই হাজার বছর আগেই যে আলোর দিশা দেখিয়েছিলেন, তা আজ আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারি ও অণুগঠনমূলক চিকিৎসার অঙ্গনে এক চিরভাস্বর আলোকবর্তিকা।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি:-

১) সুশ্রুত সংহিতা
২)দ্য জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিন (১৭৯৪)
৩)ইন্ডিয়ান জার্নাল অব সার্জারি
৪)অ্যানালস অব প্লাস্টিক সার্জারি
৫)ডি. এম. বোস, এস. এন. সেন এবং বি. ভি. সুব্বরায়াপ্পা (১৯৭১)
৬)বিভিন্ন আন্তর্জালসমূহ



ঈশ্বরকৃষ্ণের মতানুযায়ী 'সাংখ্যকারিকা'র আলোকে 'পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বালোচনা'

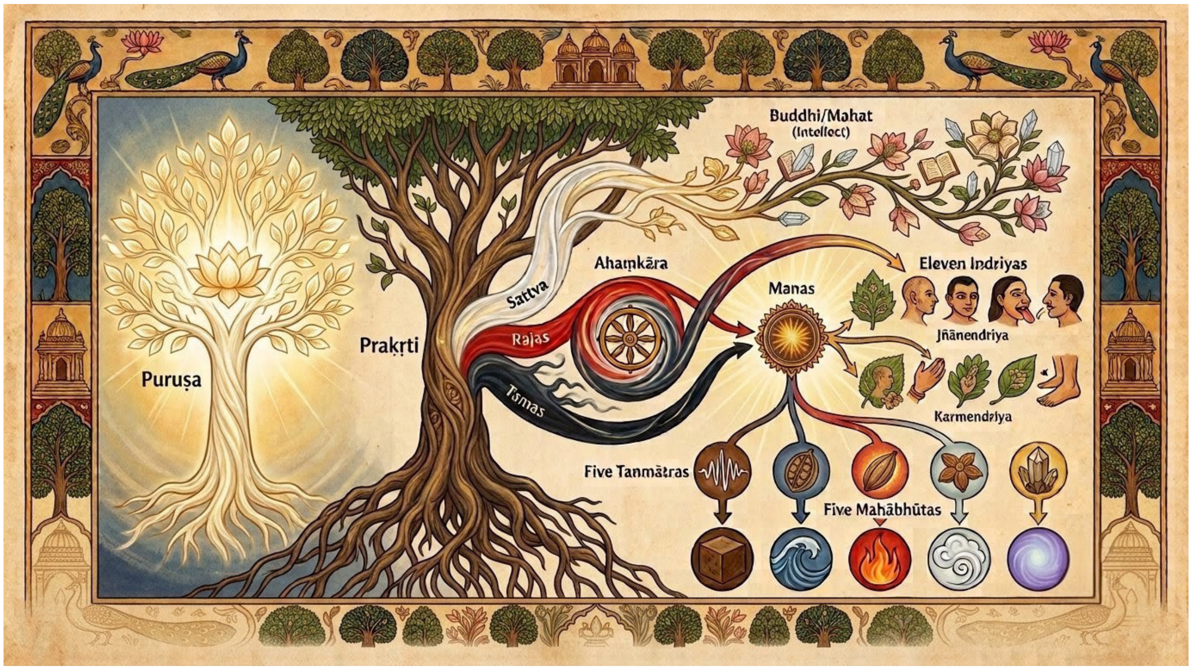
শুভজিৎ পাইন

বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনগুলি নিয়ে যখন আমরা চর্চা করতে বসি, তখন আমাদের সামনে উদ্ভূত হয় সেই দর্শন সম্প্রদায়গুলির মূল কিছু তত্ত্ব। আর এই তত্ত্বালোচনার পূর্বে প্রত্যেকটি দর্শন সম্প্রদায়ই কিছু পদার্থকে স্বীকার করে নিয়েছে, তা জগতের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই হোক বা পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রেই হোক। যেমন, প্রাচীন ন্যায় দর্শন ষোলটি পদার্থ স্বীকার করে, বৈশেষিক দর্শন ও নব্য ন্যায় দর্শন সাতটি পদার্থ স্বীকার করে। অন্যদিকে, মীমাংসকদের মধ্যে প্রভাকর মীমাংসকরা আটটি পদার্থ এবং ভাট্ট মীমাংসকরা পাঁচটি পদার্থ স্বীকার করেন। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সাংখ্য দর্শনে পঁচিশটি তত্ত্ব স্বীকৃত, যাদের একত্রে বলা হয় 'পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব'। সাংখ্যরা 'পদার্থ-এর বদলে 'তত্ত্ব' বলেন। সাংখ্য দর্শনে পঁচিশটি-তত্ত্ব হল, যথাক্রমে– পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ,স্পর্শ,রূপ,রস ও গন্ধ) এবং পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম)। আত্মা বা চেতন পুরুষ ব্যতীত সমুদায় বিশ্ব এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত। দিক ও কাল সাংখ্যমতে পৃথক তত্ত্ব নয়; এগুলি আকাশ তত্বের অন্তর্গত।

পূর্বোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে সাংখ্যদর্শন চার ভাগে বিভক্ত করেছে। চার প্রকারের মধ্যে প্রথমটি প্রকৃতি-তত্ত্বান্তর-প্রসূতি। দ্বিতীয়টি প্রকৃতিবিকৃতি-তত্ত্বান্তর-প্রসূত ও তত্ত্বান্তর-প্রসূতি। তৃতীয়টি বিকৃতি-তত্ত্বান্তর-প্রসূত। চতুর্থটি তত্ত্বান্তর-প্রসূতও নয়, তত্ত্বান্তর-প্রসূতিও নয়। অর্থাৎ, প্রথমটি কারণই, কার্য্য নয়। দ্বিতীয়টি কারণও এবং কার্যও। তৃতীয়টি কার্যই, কারণ নয়। চতুর্থটি কারণও নয়, কার্যও নয়।
যৌক্তিক ক্রমানুসারে এই চার প্রকার তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো-
i) কেবল প্রকৃতি (প্রথমটি): এই নিখিল বিশ্বের উপাদান কারণ এবং মহদাদির মূল কারণ, সেই প্রধান

কেবলমাত্র প্রকৃতি, বিকৃতি নহে। তাঁর উৎপত্তি নাই। তিনি সকল কার্যেরই উপাদান কারণ, কার্যরূপ নয়, কেবল কারণরূপেই তাঁর অবস্থান। সেই প্রধানের আবার কারণান্তর কল্পনা করতে গেলে অনবস্থা দোষ ঘটে এবং সেই অনবস্থা দোষে কোন প্রমাণ নেই।

ii) প্রকৃতি-বিকৃতি (দ্বিতীয়টি): মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র– এই সাতটি পদার্থ 'প্রকৃতি-বিকৃতি' অর্থাৎ একবার কারণ ও একবার কার্য। প্রধান থেকে মহৎ-তত্ত্বের এবং মহৎ-তত্ত্ব থেকে অহংকারের উৎপত্তি, এজন্য



মহৎ-তত্ত্ব অহংকারের উপাদান কারণ এবং মূল প্রকৃতির কার্য। অহংকার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকাশ হওয়ায় অহংকার হল একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের উপাদান কারণ এবং মহৎ-তত্ত্বের কার্য। আবার, পঞ্চ তন্মাত্র থেকে পঞ্চ-মহাভূতের উৎপত্তি। সুতরাং, পঞ্চ-তন্মাত্র পঞ্চ-মহাভূতের উপাদান কারণ এবং অহংকারের কার্য।

iii) কেবল বিকৃতি (তৃতীয়টি): পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি তত্ত্ব বিকৃতি মাত্র। স্থূল পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের গো-ঘট-বৃক্ষাদি বিকার দেখা যায়, আবার গো থেকে দুগ্ধ, দুগ্ধ থেকে দধি প্রভৃতি বিকার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বৃক্ষ থেকে বীজ, বীজ থেকে অঙ্কুর প্রভৃতি বিকার হতে থাকে। তাহলেও গো, দুগ্ধ, বীজ প্রভৃতিকে পৃথক পৃথক তত্ত্বরূপে গণনা করা হয় না, কারণ এগুলি পৃথিব্যাদি হতে তত্ত্বান্তর নয়। কারণ সাংখ্যসিদ্ধান্তে যাহা তত্ত্বান্তরের উপাদান তাহা 'প্রকৃতি' নামে প্রসিদ্ধ, তাই, গো-দুগ্ধাদি যেহেতু পৃথিবী পৃথিব্যাদি থেকে পৃথক নয়, সেহেতু এগুলি প্রকৃতিও নয়। সুতরাং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত কেবল বিকৃতি, প্রকৃতি নয়।

iv) ন প্রকৃতি ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ (চতুর্থটি): যিনি প্রকৃতিও নয়, এবং বিকৃতিও নয়; উপাদান কারণও নয় এবং কার্যও নয়, তিনি 'পুরুষ'। পুরুষ ব্যতীত অন্য চব্বিশটি তত্ত্বের মূল কারণ হলো অচেতন ত্রিগুণাত্মিকা প্রধান বা প্রকৃতি এবং পুরুষ হল নির্বিকার নিষ্ক্রিয় চেতন তত্ত্ব।

এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সমুদয় জ্ঞানই হলো সাংখ্যাধ্যয়নের ফল এবং এগুলিই হলো সাংখ্যের 'প্রমেয়'।

বেদোক্ত বহুদেববাদ ও দেবযোনির শাস্ত্রীয় প্রমাণ

শৌনক রায়চৌধুরী



ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

সমাজীরা ভ্রমিত হয়ে বেদোক্ত বহুদেববাদকে খণ্ডিত করার প্রয়াস করে থাকেন যে ভ্রান্তির শুরু দয়ানন্দ স্বামীর থেকে হয়েছিল। সমাজীদের ভ্রমহরণ ও অনার্য পাখণ্ড থেকে মুক্তি প্রদান করার জন্য এই লেখ লেখা হচ্ছে।
সবার আগে বেদের সংজ্ঞা স্পষ্ট করি। মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্ (আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ২৪.১.৩১)। নিরুক্তে (২.৩) তৈত্তিরীয় আরণ্যকের উক্তিকে নিগম বলা হয়েছে। নিগম বেদের সমার্থক শব্দ (দয়ানন্দ, ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা, বেদবিষয়বিচারঃ)। তাই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মিলিয়ে বেদ এটা স্পষ্ট হল।
এবারে বেদ থেকে দেবযোনি ও দেবতাদের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। বেদ বলছে, মনুষ্যযোনি ও দেবযোনি আলাদা (যজুর্বেদ মাধ্যন্দিন শতপথব্রাহ্মণ ৭.৪.২.৪০)। বেদে অন্যত্রও দেবতা ও মানুষদের আলাদা বলা হয়েছে (অথর্ববেদ শৌনক সংহিতা ১০.১০.২৬) অর্থাৎ দেবতা ও মানুষ সর্বদা আলাদা এটা স্পষ্ট হল। ধাতুকোষে যজ্ ধাতু আছে, যার এক অর্থ হল দেবপূজা করা (যজ্ দেবপূজাসঙ্গতিকরণদানেষু, যুধিষ্ঠির সমাজী কৃত সংস্কৃত-ধাতু-কোষঃ, পৃ. ৯৬)। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস নিজের বই ব্রহ্মসূত্রে দেবতাধিকরণ নামে এক অধিকরণ (ব্রহ্মসূত্র ১.৩.২৬-৩৩) রেখেছেন। অর্থাৎ, তিনিও দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। দেবতাধিকরণের শাঙ্করভাষ্যেও ভগবান্ আদিশঙ্করাচার্য বেদের আধারে দেবতাদের স্বীকার করেছেন (ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্য ১.৩.৩০)।

এবারে সমাজীভ্রান্তিনিবারণ করা হচ্ছে। দয়ানন্দ স্বামী এবং তাঁর অনুগামীরা দেবযোনিকে স্বীকার করেন না। উপরে উল্লিখিত প্রমাণ থেকে তাঁদের ভ্রম খণ্ডিত হয়েছে। সমাজী বিদ্বান শাঙ্করভাষ্যের আধারে বহুদেববাদকে খণ্ডিত করার প্রয়াস করেছিলেন কিন্তু সামবেদে (কেনোপনিষদ) ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি আদি দেবতাদের উল্লেখ হবার সুবাদে বহুদেববাদ স্বতঃ স্থাপিত হয়েছে। ভগবান্ আদিশঙ্করাচার্যও সেখানে "দেবতাদের অস্তিত্ব নেই" এমনটা লেখেননি। সমাজী বিদ্বান আমাদের উপরে ছল করার অভিযোগ করে নিজেই ছল করতে শুরু করেন।

দেবতাদের স্বতন্ত্র শক্তি নেই এর অর্থ এই নয় যে দেবতাদের অস্তিত্বই নেই। যেমন ভৌতিকবাদী পক্ষে পৃথিবী ভৌতিকশক্তি সূর্য থেকে লাভ করে এর অর্থ এই নয় যে পৃথিবীর অস্তিত্বই নেই। অতএব শাঙ্করসিদ্ধান্তের সঙ্গে দয়ানন্দস্বামী প্রচারিত ভ্রান্তিকে এক করা মূর্খতা মাত্র।
যজুর্বেদ বৃহদারণ্যকোপনিষদের আখ্যায়িকায় এক ব্রহ্মের স্তুতি করা হয়েছে। যদি এর থেকে সমাজীরা এই অর্থ করেন যে বহু দেবতার অস্তিত্ব নেই তাহলে এখান থেকে দয়ানন্দস্বামীকেই ভ্রমিত মানতে হবে কারণ তিনি একাধিক দেব মেনেছিলেন। উপরন্তু দয়ানন্দ অনুসারে দেবতাদের মধ্যে কেউ কেউ জড়, অতএব দয়ানন্দ অবৈদিক জড়পূজকও প্রমাণিত হলেন। উদাহরণস্বরূপ সংস্কারবিধি ও তার সমাজী ব্যাখ্যা সংস্কারপ্রকাশ দেখুন। সেখানে রামগোপাল সমাজী লিখছেন "হে জুতো,...,আমার পা দুটোকে রক্ষা করো...হে ছড়ি বা দণ্ড...আমাকে রক্ষা করো" (রামগোপাল সমাজী, সংস্কারপ্রকাশ, সমাবর্তনপ্রকরণ, পৃ. ১১২)

আমাদের পক্ষ থেকে দেওয়া প্রমাণের উপরে সমাজী বিদ্বান কোনো মন্তব্য করেননি, সম্ভবতঃ লেখ পড়তে পারেননি বা নিরুত্তর হয়ে গেছেন। আমরা বেদপ্রমাণ এটুকুই লিখেছিলাম যে দেবযোনির অস্তিত্ব আছে, দেবতা একাধিক ও দেবপূজন করা বেদবিহিত। দেবপূজাই অন্তিম মার্গ এটা তো লিখিনি। বেদেই পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার বর্ণন আছে (যজুর্বেদ মুণ্ডকোপনিষদ ১.১.৪)। এতে কর্মকাণ্ড অপরাবিদ্যা-ই, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এটা নিষিদ্ধ। বেদে দেবপূজনের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের শুরুতেই অগ্নিদেবের স্তুতি আছে (ঋগ্বেদ শাকল সংহিতা ১.১.১)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭.১০-৩) এমনটাই বলেছেন। শাঙ্করভাষ্যে এখানে দেবপূজকদের অল্পবুদ্ধি বলা হয়েছে অতএব দেবপূজা বৈধই কিন্তু অল্পবুদ্ধিদের জন্য। এটা তো লেখা হয়নি যে দেবতাদের অস্তিত্ব নেই। যদি দেবতা না হতেন তাহলে দেবপূজকদের উন্মাদ বলা হত কিন্তু শাস্ত্রে



কোথাও এমনটা দেখা যায় না যে দেবযোনি নেই, দেবপূজন নিষিদ্ধ, দেবতারা জড় যেমনটা দয়ানন্দ প্রচারিত অবৈদিক মতে বলা হয়। দেবপূজনের প্রমাণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে দিয়ে এটা পুনরায় প্রমাণিত হল যে দেবপূজা বৈদিক শ্রৌতস্মার্ত পরম্পরায় বিহিত। দয়ানন্দর কথানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর নন উপরন্তু তাঁর কথায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৭, ৯, ১০, ১১, ১২ সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত (ভূমিত্র শর্মা সমাজী কৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভূমিকা)। এখানে এই অজ্ঞাতনামা সমাজী বিদ্বান ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর মেনে নিজেই দয়ানন্দ ও অন্যান্য সমাজীদের মূর্খ প্রমাণ করেছেন।
সমাজী বিদ্বানের এটাও জানা উচিত যে শ্রৌতস্মার্ত-শাঙ্করসিদ্ধান্তে ব্যবহারিক স্তরে তো দেবতা আদি স্বীকৃতই

পরন্তু পারমার্থিক স্তরে শুধু ব্রহ্মই বিদ্যমান। আর্যসমাজ তো ঈশ বাদে অন্য উপনিষদকে বেদ মানে না আবার নিজ সিদ্ধান্তের পুষ্টির জন্য বৃহদারণ্যক আদি উপনিষদের শরণাগত হওয়া সমাজীদের সিদ্ধান্তের দীনতারই পরিচায়ক।

যজুর্বেদ বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার আদি শঙ্করাচার্য লিখেছেন, "নিবিৎসংখ্যাবিশিষ্ট দেবতাদের মধ্যে অনন্ত দেবতাদের অন্তর্ভাব আছে" (যজুর্বেদ বৃহদারকোপনিষদ ৩.৩.৯, শাঙ্করভাষ্য)। অর্থাৎ, এখানে তিনি স্পষ্ট রূপে একাধিক দেবতাদের স্বীকার করেছেন। পূর্ণ প্রকরণ পড়ার পরে এটা স্পষ্ট হয় যে এটা পরব্রহ্মের স্তুতিপরক প্রকরণ, দেবসংখ্যার নির্দেশক নয়। যদি এখানে দেবসংখ্যার নির্দেশনই লক্ষ্য হতো তাহলে একটাই সংখ্যা বলা হত, কিন্তু এখানে তো ৩০০৩ থেকে ১ পর্যন্ত সংখ্যার উল্লেখ আছে। পূর্বমীমাংসা অনুসারে যা বিধি নয়, সেই বেদবাক্যকে শাব্দিক অর্থে নেওয়া উচিত নয়। এটা এখানেও জানতে হবে।

শেষে অজ্ঞাত সমাজীবিদ্বান ভগবান আদিশঙ্করাচার্যের প্রতি দয়ানন্দরও শ্রদ্ধা ছিল এটা দেখানোর প্রয়াস করেছেন। দয়ানন্দ অদ্বৈত-শাঙ্করপরম্পরায় দীক্ষিত হয়ে সরস্বতী উপাধি লাভ করেছিলেন। এরপরে তিনি অদ্বৈতসিদ্ধান্তকে নবীন বেদান্তী তথা নাস্তিক বলেছেন, যেখানে দয়ানন্দর নিজের মতই নবীন ও অশাস্ত্রীয়। নিজ গুরুপরম্পরার বিরুদ্ধ আচরণ করার জন্য তিনি গুরুদ্রোহী ছিলেন। যদি সমাজী বিদ্বানের কথা অনুসারে দয়ানন্দ ভগবান্ আদি শঙ্করাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতেন তাহলে সমাজীরা দিবারাত্র ভগবান আদিশঙ্করাচার্য ও বর্তমান শঙ্করাচার্যদের অপমানে কেন নিমগ্ন থাকে? তাঁকে এটারও উত্তর দিতে হবে। যদি সমাজী বিদ্বান ভগবান আদিশঙ্করাচার্যকে মানেন তাহলে তাঁর উচিত দয়ানন্দ ও দয়ানন্দীদের ত্যাগ করে আদিশঙ্করাচার্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

অতএব বেদ ও শাঙ্করভাষ্যালোচন করে দেবযোনি, দেবপূজন পুনর্স্থাপিত ও অনার্য পাখন্ডের খণ্ডন সম্পন্ন হলো। আশা করি সমাজীরা নিজের অবৈদিক সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করে বৈদিক সিদ্ধান্তের প্রতি শরণাগত হবেন। সকলের মঙ্গল হোক।

দ্রষ্টব্য: এই লেখের বিরুদ্ধে যাবতীয় আইনি কার্য মহামান্য কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের অধীনে পড়ছে।



বাংলাদেশ ও ভারতের ছাত্র আন্দোলন কোথাও এক-সূত্রে বাঁধা

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে চলছে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের ব্যাপক, নৃশংস, অমানবিক অত্যাচার। কী হচ্ছে না! আক্রমণ, খুন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং মহিলাদের উপর অমানবিক নির্যাতন, ভয়াবহ ব্যাপার। বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। আত্মরক্ষার্থে বাংলাদেশের অসহায় হিন্দুরা যখন গণতান্ত্রিক পথে তাদের প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে তখনই তাদের কণ্ঠরুদ্ধ করতে অন্যায় ও অত্যাচারের এক নতুন পর্যায় প্রকটভাবে শুরু হয়েছিল। ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস এইরকম এক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাকে আটক করে তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা শুরু হয়েছে। তার পক্ষে যাতে কোনো হিন্দু উকিল দাঁড়াতে না পারে তাদের বিরুদ্ধেও অপরাধমূলক মামলা আনা হয়েছিল। এই নৃশংসতা ভাবা যায় না।

এই ইসলামিক গজওয়ারি খুব পরিকল্পনানুসারে করা হয়েছে ও হয়ে চলেছে। গোড়ায় আন্দোলনকে নিরীহ চেহারা দিয়ে শুরু করা হল বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য, যার আড়ালে ছিল হিংস্র ইসলামবাদী চরমপন্থী মুখ। কীভাবে এইটা ঘটানো হলো, সেই ক্রমিক ধারাবাহিক পর্যায়গুলো নিচে উন্মোচিত করা হলো।

প্রথমে দেখানো হলো নিরীহ ছাত্র আন্দোলন হচ্ছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন যার কোনো ভিত্তিই ছিল না কারণ সরকার তা বাতিল করেছিল। বরং ৫ জুন ২০২৪ বাংলাদেশ হাইকোর্ট কোটা পুনর্বহাল করে, মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য সিভিল সার্ভিসের ৩০% পদ সংরক্ষণ করে। পরদিন ৬ই জুন জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র শাখা উদ্যোগ নিয়ে পুলিশ স্টেশন, রাস্তা এবং প্রয়োজনীয় স্থান অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। ঢাকা, জগন্নাথ হল, শেরে বাংলা কৃষি, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ হয়। এই ঘটনার সুযোগ নেয় চীন ও পাকিস্তান। কট্টর ইসলামপন্থীরা ভারতবিরোধী এজেন্ডা প্রচার এবং বাংলাদেশে হিন্দুবিরোধী পরিবেশ তৈরি করে। একপর্যায়ে এই আন্দোলন শেখ হাসিনাবিরোধী অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। পরিস্থিতি অবনতি হলে সেনাপ্রধানের উদ্যোগে শেখ হাসিনাকে নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ভারতে পাঠানো হয়। এরপর থেকে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার ঘটতে থাকে। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে হাসিনা সরকার গিয়েছিল

সুপ্রিম কোর্টে; সেখানে সেই মামলার রায়দান অপেক্ষমাণ ছিল। আসলে এসবই ছিল মুখোশ। আর আমাদের মুসলিম তোষণে সদাতৎপর বঙ্গীয় বামপন্থীরা তাদের সমর্থনে কলকাতায় বিক্ষোভ আন্দোলন করল।

তিনটি গোষ্ঠী ক্ষমতার শূন্যস্থানের নিয়ন্ত্রণ নিল। বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি–এরা ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলো চালায় এবং বাংলাদেশে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এরপর জামায়াতে ইসলামী। আমলারা আছে এদের মধ্যে। এরা কট্টর ইসলামি কর্মসূচী রূপায়ণে অঙ্গীকারবদ্ধ। তৃতীয় হলো তাহরির, একটা উগ্র সংগঠন। তারা ওকালতি করে খলিফাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এবং সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে লিপ্ত। সামরিক বাহিনীর মধ্যে এদের প্রভাব আছে। এসব ঘটনা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার পক্ষে, বিশেষত ভারতের জন্য, ঘোর হুমকিস্বরূপ।

বাম-উদারপন্থী বা লেফ্ট-লিবারেল বাস্তুতন্ত্র সক্রিয়ভাবে এই তিন গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা করছে এবং এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই অবৈধ অভ্যুত্থানকে যুক্তিপূর্ণ ও বৈধ করার জন্য একযোগে কাজ করছে।

শেখ হাসিনার তথাকথিত পদত্যাগের পরে গণ্ডগোল আরম্ভ হলো এবং একাধিক কারাগার ভেঙে লোক ঢুকে পড়ল। প্রতিবাদী সেজে কিছু লোক সন্ত্রাসবাদী-সহ ১৫০০ বন্দীকে মুক্ত করে দিল।

২০২৪-এর ৯ই আগস্ট বাংলাদেশের হিন্দুরা প্রতিবাদে সমবেত হলো। তারা হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিশানা করে সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল।

গোপালগঞ্জ এলাকায় হিন্দুরা সরকারবিরোধী প্রতিবাদে গর্জে উঠল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে সেনাবাহিনী তাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে হানাদারি শুরু করল; আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল। এই ঘটনার পরে ২০১ জন নতুন যুগ্ম-সচিব এবং কয়েকজন অতিরিক্ত সচিবকে নিযুক্ত করা হলো। হিযবুত তাহরির তাদের কাজে লাগিয়ে অপব্যবহার করছে। ২৬শে আগস্ট ২০২৪-এ আল-কায়েদা-অনুপ্রাণিত চরমপন্থী আনসারুল্লা বাংলা দলের প্রধান মুফতি জসিমুদ্দিনকে জামিন দেওয়া হলো। সে একজন উগ্র ইসলামবাদী।

৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ মহম্মদ ইউনূসকে ৯২ জন নোবেল পুরষ্কার বিজেতা এবং ১৯৭ জন বিশ্ব নেতা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানাল।

বাংলাদেশে প্রায় ১,০০,০০০ অস্ত্র লুট করা হয়েছে এবং এটা ঐ দেশের ও পার্শ্ববর্তী সংলগ্ন ভারতের জন্য আইনশৃঙ্খলার বিপর্যয় ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। তাজুল ইসলামকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের মুখ্য প্রসিকিউটর নিয়োগ করা হয়েছে, যারা রাজনৈতিক বন্দীদের বিরুদ্ধে মামলার দেখাশোনা করবে।

বাংলাদেশ রেডিও উর্দুতে কর্মসূচী প্রচার করা আরম্ভ করেছে, যাতে পাকিস্তানের উস্কানি আছে।

চীন বাংলাদেশে বৃহদাকারের বিনিয়োগ শুরু করেছে। এতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব ও ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুতর পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলে। সাম্প্রতিক অবৈধ অভ্যুত্থানের পরপরই এই আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে যে বাংলাদেশ ক্রমশ পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় সাধারণত শিক্ষকতা, কৃষি ও ছোট ব্যবসায়ের মত পেশায় জড়িত থাকে। দেশের সমাজ-অর্থনীতিতে তাদের যথেষ্ট পরিমানে অবদান আছে। কিন্তু বাংলাদেশে অবৈধ অভ্যুত্থানের পর থেকে হিন্দুদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমছে। এই ভয়াবহ প্রবণতার জন্য তাদের সুরক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হিন্দু রাজনীতিবিদরা লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং প্রায় ১,২৫,০০০ হিন্দু গ্রাম ও শহরের উপান্তে বাস করছে। হিন্দু নেতা ও পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে, মিথ্যে খুনের অভিযোগও আনা হচ্ছে। এতে তাদের অবস্থা আরো করুণ করে তুলছে। সরকার ১৫০০ জন হিন্দু শিক্ষককে জোর করে পদত্যাগ করিয়েছে এবং সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর হিন্দু কর্মচারীদের সময়ের আগেই অবসর নিতে বাধ্য করেছে। খুব পদ্ধতিগতভাবে জনজীবনে তাদের গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বরিষ্ঠ সাংবাদিক গৌরবকুমারের মতো অনেক হিন্দু সাংবাদিককে নিশানা করা হয়েছে। অনেককে বন্দী বা খুন করা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের হয়রানি খুব গুরুতর সমস্যার আকার নিয়েছে, কারণ তাদের নিরাপত্তা ও জীবিকা ব্যাহত হচ্ছে। দুর্গাপুজোর মতো হিন্দু উৎসবগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ঘটানো হয়, যার মধ্যে পাথরবাজিও থাকে। এইসব ধর্মীয় উদযাপনের সময়ে ক্রমবর্ধিত হারে ইসলামিক উগ্রপন্থী কার্যকলাপ হিন্দুদের মনে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়ে দেয়।

অনেক সংবাদে ইঙ্গিত করছে যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হিংসার ৫৭% মন্দিরের বিরুদ্ধে ঘটানো হয়, হিন্দুদের উপাসনাস্থল ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। হিন্দু নারী ও বালিকাদের হয়রানি করে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। বালিকাদের অপহরণ নিত্য ঘটনা। এই কুকর্মগুলো বৌদ্ধদের মতো অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপরও করা হয়। এটা জাতিগত নির্মূলকরণ প্রচেষ্টার দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করে। বাংলাদেশে অনেক উগ্রপন্থী গোষ্ঠী ভারতকে ভাঙার লক্ষ্য নিয়ে সক্রিয়ভাবে মিথ্যা আখ্যান প্রচারে সক্রিয়। তাদের কৌশল হলো কথায় কথায় ভারতের "চিকেন'স নেক"-এর উপর আক্রমণের ভয় দেখানো, অবশিষ্ট ভারত থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার অভিপ্রায়ে।

অনেক উগ্রপন্থী গল্প বিস্তারিতভাবে ছড়ানো হচ্ছে সমাজমাধ্যমে। খবর মিলেছে, এইসব উগ্রপন্থী গোষ্ঠীদের মধ্যে কয়েকটা কুকি জঙ্গীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তাদের উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে পাঠিয়ে সেখানে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে। মহম্মদ ইউনূস ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, এই দুই দেশ ভারতবিরোধী কোনো বৃহত্তর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে চলেছে। ১১ই নভেম্বর, ২০২৪, ১৯৭১ সালের পরে প্রথম কোনো পণ্যবাহী জাহাজ সরাসরি পাকিস্তান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছল। বাংলাদেশ পাকিস্তানি পণ্যের উপর আমদানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, পাকিস্তান থেকে আসা পণ্যের উপর থেকে অত্যাবশ্যকীয় বস্তুগত পরিদর্শন তুলে দেওয়া হয়েছে, যাতে আগে যথেষ্ট দেরি হত। ভারতের কৌশলগত স্বার্থকে উপেক্ষা করে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে জোট ক্রমশ বাড়ছে। পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাংলাদেশে উর্দু শিক্ষণ জোরদার করতে সম্প্রতি এক স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেছে। পাকিস্তানের হাই কমিশন এই সব ধরণের উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে তৎপর। এর ফলে এই অঞ্চলের শিক্ষা ক্ষেত্রে লক্ষণীয় প্রভাব পড়বে।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনা চলছে একটা পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর করার, তার সঙ্গে আছে সামরিক প্রশিক্ষণও। এইসব চালাচ্ছে বাংলাদেশের ভিতরের পাকিস্তান-লবি। এদের অস্তিত্ব আছে ১৯৭০-এর দশক থেকে। বাংলাদেশের কিছু উগ্রপন্থী গোষ্ঠী ভারতের বিরুদ্ধে ঘৃণাপূর্ণ গল্প ছড়াচ্ছে । তারা ভারতের পতাকা পায়ের তলায় মাড়াচ্ছে। ভারতবিরোধী মানসিকতা এতে স্পষ্ট। এইসব আখ্যান ও কর্মতৎপরতা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতি এক তাৎপর্যপূর্ণ হুমকি উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থী উপদলগুলো ও উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোর মিলিত প্রচেষ্টা আমাদের সামনে এক মস্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়, যা কোনোভাবেই উপেক্ষা করা উচিত নয়। বাংলাদেশ ইসলামায়নের দিকে যাচ্ছে, পাকিস্তানের থেকেও দ্রুততর বেগে। কারণ বাস্তুতন্ত্র মনে করে বাঙালি হিন্দুরাই ভারতে হিন্দু নবজাগরণ ঘটিয়েছিল। তাদের খতম করা দরকার।

২০২৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিএনপির তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে, কিন্তু হিন্দুদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরে। তারা প্রতিদিন মুসলিমদের বর্বর আক্রমণের শিকার হচ্ছে। ভারত সরকার বাংলায় নবনির্বাচিত বিজেপি সরকারের সহায়তায় সীমান্তে কাঁটাতার লাগানো, অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ করে বিতাড়ণের পরিকল্পনা করেছে। এছাড়া বহুবিতর্কিত চিকেন'স নেকে জোরদার সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজনো হচ্ছে। তবে ভারত সরকারকে এই হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নিতেই হবে। অন্ধ মুসলমানরা কখনোই হিন্দুদের শান্তিতে থাকতে দেবে না।

ভারতের প্রেক্ষাপট:

২০২৬-এর ১৬ই মে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত আইন, সাংবাদিকতা এবং সমাজকর্মে যুক্ত নির্দিষ্ট কিছু কর্মহীন তরুণকে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আক্রমণকারী আরশোলা ও পরজীবী বলে বর্ণনা করেন। এর পরদিনই কক্রোচ জানতা পার্টির (সিজেপি) জন্ম। শুরুতে একে ব্যঙ্গাত্মক প্রতিক্রিয়া মনে হয়েছিল। কিন্তু সিজেপির ইনস্টাগ্রাম ও X (পূর্বতন টুইটার)-এ আলোচনার ঝড় ওঠে। সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এই অনলাইন স্টান্টের বিজেপিবিরোধী এজেন্ডা ফাঁস করে দিয়ে নিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে দিয়েছে।

সিজেপির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, এটা সেইসব তরুণদের জন্য, যাদের অলস, সারাক্ষণ অনলাইনে

থাকা এবং অতি সম্প্রতি আরশোলা বলে ডাকা হয়। স্পষ্টই দীপকে এমন কিছু শব্দ বেছেছেন, যা তার লক্ষ্যগোষ্ঠী অর্থাৎ জেন-জি নিজেদের সঙ্গে মেলাতে পারে এবং যাদের কাছে এটা বেশ সন্তোষজনক মনে হবে। অনেকের কৌতূহল, কেন প্রধান বিচারপতির মতো অরাজনৈতিক ব্যক্তির মন্তব্যের ব্যঙ্গাত্মক প্রতিক্রিয়া থেকে সরে এসে এই তথাকথিত আন্দোলন বিজেপির সঙ্গে ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার প্রতিযোগিতায় নামল, যা এখন পুরোপুরি বিজেপিবিরোধী রাজনৈতিক 'ইকো-চেম্বার'-এ পরিণত হচ্ছে। এর উত্তর নিহিত রয়েছে সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে-র রাজনৈতিক পটভূমিতে; তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। দীপকে নিজেকে রাজনীতি-নিরপেক্ষ এবং 'ক্ষুব্ধ' 'জেনারেশন-জি'-এর প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও, তিনি সরাসরি আপের নির্বাচনী ও সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারাভিযানে যুক্ত। ২০২০-তে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে, সংবাদ প্রতিবেদনে তাকে পুনের ২৩ বছর বয়সী এক তরুণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আপের সোশ্যাল মিডিয়া রূপান্তরের নেপথ্যে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, কেজরিওয়ালকে তুলে ধরতে এবং বিজেপি ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে আপ বিভিন্ন আকর্ষণীয় স্লোগান, প্যারোডি ভিডিও, ছোট ক্লিপ ও 'মিম' (meme) ব্যবহার করছিল। প্রতিবেদনে অভিজিৎ দীপকে-র বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, কীভাবে 'মিম' ও ভিডিওর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে এবং প্রথমবার ভোটাদের কাছে রাজনৈতিক বার্তাগুলোকে সহজবোধ্য করে তুলতে হয়। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি আপের (AAP) আইটি ও মিডিয়া প্রধান অঙ্কিত লালের অধীনে কাজ করতেন। ২০১৯-এর আগস্টে 'লিগ্যাল রাইটস অবজারভেটরি' তৎকালীন আপের পুনে শাখার নেতা অভিজিৎ দীপকের বিরুদ্ধে



এক অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের বিষয় ছিল–"কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর নৃশংসতা নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালানো এবং কাশ্মীরিদের মধ্যে 'হুরিয়তের আদলে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব' উস্কে দেওয়া।" অভিযোগ করা হয়েছিল, মোদী সরকার যখন সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে, তখন দীপকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রচারণায় লিপ্ত হয়েছিলেন। পুনে পুলিশের কাছে দায়ের করা এলআরও-র অভিযোগে বলা হয়েছিল–অভিজিৎ দীপকে নামে একজন আপের সোশ্যাল মিডিয়া সমন্বয়ক এবং তার এক যাচাইকৃত টুইটার অ্যাকাউন্ট আছে। তিনি কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর দমন-পীড়ন ও নৃশংসতা নিয়ে প্রকাশ্যে 'ভুয়া খবর' ছড়াচ্ছেন।

'দ্য স্টেটসম্যান'-এর সঙ্গে আলাপকালে এলআরও-র বিজয় জোশী নিশ্চিত করেন, এই আইনি অধিকার সংস্থা ২০১৯ সালেই অভিজিৎ দীপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল। জোশী জানান, বছরের পর বছর আশ্বাস দেওয়া এবং বিষয়টি নিয়ে বারবার যোগাযোগ করা সত্ত্বেও পুলিশ দীপকের বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর বা মামলা দায়ের করেনি। জোশী বলেন–"আমি বিষয়টি নিয়ে ক্রমাগত খোঁজখবর নিচ্ছিলাম, কিন্তু ছয় বছর পরেও এখন কোনো এফআইআর করা হয়নি।" এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, দীপকে

২০২০ সালে দিল্লি দাঙ্গায় হিন্দুবিরোধী সহিংসতার দায়ে অভিযুক্ত উমর খালিদেরও সমর্থক। তিনি খালিদের দীর্ঘকাল ধরে বিচারহীন অবস্থায় কারাবন্দী থাকার বিষয় নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে ইঙ্গিত দিয়েছেন, খালিদকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জেলে পচানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে মামলার শুনানিতে মোট ১৪ বার মুলতবির ঘটনা ঘটলেও এর মধ্যে ৭ বার বিলম্ব বা মুলতবির আবেদন করেছিলেন খোদ উমর খালিদ নিজেই। 'অবিচারের' যে বয়ান প্রচার করা হচ্ছে–তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র হলো এই যে, অভিযুক্তের আইনজীবীর তথাকথিত 'ফোরাম শপিং'-এর ব্যর্থ প্রচেষ্টার কারণে খালিদকে এত দীর্ঘ সময় ধরে কারাগারে পচতে হচ্ছে।

দীপকে আম আদমি পার্টির (AAP) 'ওয়ার রুম'-এর অংশ ছিলেন এবং তিনি ধারাবাহিকভাবে বিজেপিবিরোধী রাজনৈতিক অবস্থান বজায় রেখে চলেছেন। সিজেপি আপাতদৃষ্টিতে হাস্যরসাত্মক আবরণের আড়ালে বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, কর্পোরেট স্বার্থ, সংবাদমাধ্যম ও দলবদলকারী রাজনীতিবিদদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে বিরোধী শিবিরের অবস্থান এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে; আর এভাবেই তারা দলীয় বা পক্ষপাতদুষ্ট বার্তাগুলোকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছদ্মবেশে পরিবেশন করে থাকে। সাম্প্রতিক অতীতে আমরা দেখেছি, কীভাবে পাকিস্তান, কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিজেপিবিরোধী দলগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করেছে; আর এখন যখন বিরোধী শিবিরের নতুন 'ট্রেন্ড'বা শ্লোগান–'কক্রোচ জনতা পার্টি'–ভারতের এই বৈরী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সমর্থন পাচ্ছে বলে খবর মিলছে, তখন এটা স্পষ্টই ইঙ্গিত দেয় যে সিজেপি আসলে বিজেপিবিরোধী এক পরীক্ষামূলক প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়– যার মূল সম্বল একটা 'কুল'এবং 'Gen-Z' প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয় জনসংযোগ কৌশল। এটা বিরোধী শিবিরের আঁকড়ে ধরা আরেকটি সাময়িক 'ট্রেন্ডিং 'ধারণা মাত্র– যা দিয়ে তারা বিজেপির রাজনৈতিক আধিপত্যে ফাটল ধরাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এই ছাত্র আন্দোলন কখনোই ছাত্র আন্দোলন ছিল না এমনকি তাদের মূল কারণ নীট পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও ছিল না। এটা ছিল সম্পূর্ণভাবে হিন্দুবিরোধী ও ভারত ভাঙার একটা ছক। এর পিছনে আছে শুধু ডিপ স্টেট নয়। এর পিছনে আছে বিশ্ব খ্রিস্টানিটি ও ইসলামিক সুদূর পরিকল্পনা– তা হলো হিন্দু ধর্মের উৎখাত ও ভারতকে টুকরো করা। বাংলাদেশে উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু বিতাড়ণ ও ভারতকে ঘিরে ধরা। অর্থাৎ সব একটা বিন্দুতে এসে মিলছে– তা হলো হিন্দু নির্মূলকরণ ও ভারতকে স্থায়ীভাবে দুর্বল করা। বাংলাদেশে তারা সফল হলেও ভারতে সেটা সম্পূর্ণ করা যায়নি। তবু সাবধানের মার নেই। অতএব, হিন্দু এক হও।



বৈষ্ণব-বিরোধী বিবেকানন্দ : বৈষ্ণব সাধুর বিপরীতে স্বামী বিবেকানন্দ-একটি কাল্পনিক কথোপকথন

শ্রী দীপঙ্কর চন্দ্র দে তালুকদার

গঙ্গার তীরে বসে স্বামী বিবেকানন্দ উদাস মনে গান গাইছেন....
মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া, যানেকো দে।
যানেকো দে রে সেঁইয়া, যানেকো দে (আজু ভালা)।
মেরা বনোয়ারী, বাঁদি তুহারি
ছোড়ে চতুরাই সেঁইয়া, যানেকো দে (আজু ভালা).......
পাশ দিয়ে তখন এক বৈষ্ণব সাধু যাচ্ছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরেই স্বামীজীর গান শুনছিলেন।

স্বামীজি আবার গান ধরলেন
"তুলসী জগমে আইয়ে সবসে মিলিয়ে ধায়।
ন জানৈ কেহি ভেক মে নারায়ন মিলি যায়....।।
বৈষ্ণব সাধুটি তখন স্বামীজীর গানের প্রশংসা আর না করে পারলেন না।
বৈষ্ণব: হরে কৃষ্ণ। মহাশয়, অসাধারণ গাইলেন আপনি। স্বয়ং মা সরস্বতী যেন আপনার কণ্ঠে বসেছেন।
স্বামীজী: প্রণাম নেবেন বাবাজি। সবই তার কৃপা।
বৈষ্ণব: এত সুন্দর গান আর তার কথা। মনে হচ্ছে যেন, যিনি গানটি লিখেছেন তিনি রাসলীলা স্বচক্ষে দেখছেন। এটা কার লেখা?
স্বামীজি: মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া.. এটা আমার নিজের লেখা গান।
বৈষ্ণব:(রীতিমতো বিস্ময়ে অবাক হয়ে) বলেন কি! এ কি করে সম্ভব! বিষয়টি স্ববিরোধী হয়ে গেল না? একমুখে দুই রকম কথা।

স্বামীজী : কি রকম?
বৈষ্ণব:(কিছুটা অভিমানী কণ্ঠে) এইযে, আপনি মায়াবাদী হয়েও কৃষ্ণের ভজন গাইছেন। কিন্তু কৃষ্ণকে অর্ধেক মানেন অথচ অর্ধেক মানেন না। রাধারাণীকে তো মানেনই না।। তাহলে বিষয়টি কি দাঁড়ালো?
স্বামীজী: জানিনা কে আপনার মাথায় এসব ঢুকালো!? আমার নিজেরও খেয়াল হচ্ছেনা জেনে বা না জেনে নিজের এত বড় পাপের বোঝা কিভাবে বৃদ্ধি করলাম!
বৈষ্ণব: মহাশয়, কৃপা পূর্বক আপনি এই বিষয়ে আমার মনের সন্দেহ দূর করুন। আপনি একজন মায়াবাদী সন্ন্যাসী। আপনি রাধারাণীকে কেন মানেন না?? গেরুয়া বসন ধারণ করেও কেউ রাধে শ্যামের বিরোধিতা করবে হিন্দু হয়ে তা আমি কখনোই মন থেকে মেনে নিতে পারবো না।
স্বামীজি: দেখুন বাবাজি। প্রথমত আমি মায়াবাদী নই। আচার্য শঙ্কর কখনোই অদ্বৈতবাদকে মায়াবাদ বলেননি। তিনি ব্রহ্মকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। অদ্বৈতবাদের যদি অন্য কোন নাম হতে পারে সেটা কেবল ব্রহ্মবাদ।
বৈষ্ণব:(মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) কিন্তু লোকে তো আপনাদের মায়াবাদী বলে!
স্বামীজি: কত লোক বৈষ্ণবদেরকেও নপুংসক ও পুরুষত্বহীন সমকামী বলেন। প্রকৃত বৈষ্ণবদের তাতে কি যায় আসে!
বৈষ্ণব:(তার মুখে আপাতত কোন কথা নেই)
স্বামীজি: আপনি বলছেন আমি রাধারাণীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিনা। আমি জানিনা আপনি এটা কোথায় শুনেছেন বা আমার কোন বক্তৃতায় পড়েছেন।
যখন ভারত জুড়ে তথাকথিত নবজাগরণের ঢেউ ওঠে, বড় বড় বিদেশি দার্শনিকরা যখন সরাসরি রাধারাণীর অস্তিত্ব অস্বীকার করে কিংবা যখন এই খোঁদ ভারতবর্ষের কিছু নামকরা লেখক সরাসরি শ্রীমতির অস্তিত্ব অস্বীকার করে সে জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে বলেছিলাম,
"বিদেশি গবেষকদের মন মত না হলে সব কিছু বাদ। তাই যদি হয়, গোপীদেরকে জলে ভাসাইয়া দাও। সব বাদ। এমনকি কৃষ্ণের অস্তিত্বও বাদ। কারণ, তা তথাকথিত বিদেশী গবেষকদের মন মত হয়নি।

গোপিদের সেই নিষ্কাম প্রেম কেই বা বুঝবে। আজকাল অনেকেই রাসলীলার মধ্যে অশ্লীলতা খুঁজে পায়।। কিন্তু তারা কি জানেনা এর রচয়িতা যিনি চিরপবিত্র ব্যাস-তনয় শুকদেব তাহলে তা কি করিয়া অশ্লীল ও অপবিত্র হতে পারে।
যে লোক প্রেমের মাধুর্য বুঝতে পারেনা,তার জন্য আমি এক কানা কড়িও দিতে রাজি নই।।
(বলিতে বলিতে স্বামীজির কণ্ঠ কিছুটা ভারী হয়ে গেল)
প্রেমে কোন ভয় নাই, কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই।
হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন! যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছো, তোমার জন্য তাহার পিপাসা বর্ধিত হইয়া থাকে। তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়। সে তোমায় ব্যতীত আর সব ভুলিয়া থাকে। সেই স্পর্শ যা ভক্তকে পাগল করিয়া দেয়, যাহা মানুষকে দেবতা করিয়া তোলে। (অশ্রুসিক্ত)
বৈষ্ণব: ক্ষমা করুন মহারাজ। আমি জানতাম না আপনার হৃদয়ে এত প্রেম, এত ভক্তি। আমি আপনার স্বরূপ বুঝতে পারিনি।
স্বামীজী:(কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে) এই কিছুক্ষণের জন্য হলেও তাকে স্মরণ করতে পেরে আমি ধন্য।
ভুল বোঝাবুঝি তো পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মের অংশ। জানি আপনার মনের সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হয়নি। আপনি আর কি কি জানতে আগ্রহী অনুগ্রহপূর্বক আমায় বলুন।
বৈষ্ণব: যা বুঝলাম রাধারানীর প্রতি আপনার ভক্তি অসীম।
স্বামীজি: আমার আচার্য পরম্পরার কেউ ই শ্রীমতির অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। আমার সৌভাগ্য, শ্রীমতির কৃপায় তার ক্ষণকালের জন্য তার দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।
বৈষ্ণব: কিন্তু আপনি আপনার অসাধারণ বাগ্মিতার মাধ্যমে বিশ্বজয় করে আসলেন। কিন্তু কৃষ্ণের বিষয়টিকে আপনি শুরুতে বলেন নি কেন? কৃষ্ণ ছাড়া ধর্মের প্রচার হয় কি করে?

স্বামীজি: দেখুন শুরুতেই কৃষ্ণের কথা বললে মানুষ কখনোই কৃষ্ণকে গ্রহণ করবে না। তারা বলবে আমাদের তো যীশু খ্রীষ্ট আছেন তাহলে কৃষ্ণের প্রয়োজন কি? আমার কৃষ্ণ বিষয়ে বক্তৃতা শুনে এক পরমা সুন্দরী রমণী সব ত্যাগ করে নির্জন দ্বীপে তপস্যার জন্য চলে যায়। বিষয়টি আমাকে সত্যিই খুব অবাক করেছিল। তবে কৃষ্ণের প্রচার থেমে থাকবে না। কালে কালে এরকম আমার মত অনেকেই আসবে।

বৈষ্ণব: আচ্ছা।। তবে আপনি এত সুন্দর ভজন গাইলেন। কিন্তু কীর্তনের মত সংগীতের এত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ কিভাবে আপনার চোখ এড়িয়ে গেল। কীর্তনের বিষয়টি আপনার দৃষ্টিতে কি রকম?
স্বামীজি: দেখুন, কীর্তন আমার দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যায়নি। আমার দৃষ্টিতে ধ্রুপদ,খেয়াল প্রভৃতিতে আছে বিজ্ঞান। আর কীর্তনে রয়েছে তীব্র ব্যাকুলতা। যদি কেউ এই বিজ্ঞানের সাথে তীব্র ব্যাকুলতার যথার্থ সংযোগ ঘটাতে পারে তবেই আদর্শ সংগীত সৃষ্ট হয়। যথার্থ প্রেম একমাত্র কীর্তনের ভাষাতেই ফুটে ওঠে।
বৈষ্ণব: কিন্তু আপনাদের তো সচরাচর কীর্তন করতে দেখা যায় না। আপনারা কি কীর্তন করেন?
আপনারা কি মহাপ্রভুকে মানেন?
স্বামীজি: কি বলছেন আপনি! মহাপ্রভু সাক্ষাৎ প্রেমের অবতার। তিনি রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু। তাকে অস্বীকার করে কেউ কিভাবে ভক্তি মার্গে এগিয়ে যাবে?
বৈষ্ণব: কিন্তু আপনার এত ভক্তি মার্গ অস্বীকার করেন যতটুকু জানি। শুধু যোগ আর ধ্যান করলেই মানুষ ভগবান হয়ে যায়। এগুলো কি হাস্যকর নয়? এটা কি ধর্ম?
স্বামীজি: ভক্তি মার্গ অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। কলিযুগে ভক্তিই প্রশস্ত। তবে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য হওয়া উচিত চতুর্যোগের সমন্বয় করা। যোগ সম্পর্কে এটা আপনার ভুল ধারণা, কিন্তু সেটি এখন আলোচনার বিষয় নয়। আপনার কথার সহজ সরল উত্তর হচ্ছে, প্রথমত চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের নিকট ভগবান রুপেই পূজিত হন, যেমনটি আমার গুরুদেব। তার এবং শ্রী চৈতন্যে কোন ভেদ দেখিনা আমি। প্রতিবছর বেলুড় মঠে জন্মাষ্টমী এবং দোল পূর্ণিমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সেদিন আমরা ধুমধাম করে সারাদিন কীর্তন করি। আমি বৈষ্ণবদের দাসানুদাস; অপেক্ষায় থাকবো একদিন অবশ্যই পদধূলি দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করবেন। আর ভগবানের কীর্তি বর্ণনা কেউ খোল করতাল বাজিয়ে করছে কিংবা কেউ চুপচাপ এক কোণে ঘরে বসে নিজের মনে মনে করছে। চূড়ান্ত অবস্থায় লক্ষ্য একই।
বৈষ্ণব: সবই বুঝলাম। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুকে যদি আপনারা মেনে থাকেন তাহলে ওনার থেকে কি শিক্ষা পেয়েছেন?
স্বামীজি: চৈতন্যদেব ছিলেন কঠোর ব্রহ্মচারী। তিনি পর নারীর মুখ দেখতেন না। কে কি পেল বা না পেল সেটা না ভেবে উনার তীব্র বৈরাগ্য আর ত্যাগের ভাবটিই নিন না। উনি আমাদেরকে প্রেমের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কিন্তু উনার অপ্রাকৃত প্রেম বুঝার সাধ্য সাধারণ মানুষের নেই।
বৈষ্ণব: আপনি চৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত প্রেমের প্রশংসা করলেন। কিন্তু মহাশয়, আপনি আপনার বিভিন্ন বক্তৃতায় বৈষ্ণবদের কে নিয়ে নানান মন্তব্য করেছেন যেগুলো আমার পক্ষে হজম করা কষ্টকর। তার ব্যাখ্যা কি? যারা মধুর ভাবে সাধনা করে তাদের কি কোন লাভ হয় না??
স্বামীজি: এটি আরেকটি বিভ্রান্তির নামান্তর! মধুর ভাবে সাধনায় ভগবানকে কাছে পাওয়া যায়। এটা ঠিক। কিন্তু এ পথে একটু বিপত্তি আছে। যিনি ভগবানকে মধুর ভাবে সাধনা করবেন তিনি হবেন কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী, দেহ বুদ্ধিহীন। তার মনে জাগতিক কোন বিষয়ের প্রতি কোন লোভ থাকবে না। কিন্তু আজকাল কিছু মানুষ মধুর ভাবে সাধনার নামে বিষয়টিকে একেবারে হাস্যকর একটা পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। আগেই বলেছি চৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত প্রেম সাধারণের বোঝার ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।
কিন্তু কিছু মানুষ মহাপ্রভুকে আদর্শ বানাতে গিয়ে উল্টো তার আদর্শ না মেনে বরং তাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করছে। একমাত্র পরম পুরুষ শ্রী কৃষ্ণ আর বাকি সবাই প্রকৃতি। এই ভাব হুট করে সবার মধ্যে ঢুকবে না। এক লাফে কেউ পর্বতে উঠতে পারে না। ধীরে ধীরেই উঠতে হয়। ফলস্বরূপ, এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে বৈষ্ণবদের মধ্যে বিকৃত যৌনাচার প্রবেশ করেছে। কিছু মানুষ বাইরে থেকে তাদেরকে সাত্ত্বিক

বলে মনে হলেও এরা ঘোর তামসিকতার আবরণে আচ্ছাদিত। হাজার বছর ধরে আমরা এই আবরণ ভেদ করতে পারছি না। ফলস্বরূপ আমাদের মনের মধ্যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দাসত্ব ঢুকে আছে। যিনি ভক্ত হবেন তিনি বীর। অনধিকার চর্চা করতে গিয়ে কোন ভক্ত অন্তত বিকৃত যৌনাচারে প্রবেশ করবেন না।
বৈষ্ণব: আপনার সাথে আমি একমত। এইজন্য শাস্ত্রে অধিকারী এবং অনধিকারী বিষয়টি রয়েছে। আপনি অনেক জায়গায় শাকাহারের নিন্দা করেছেন। কিন্তু এটা কি কোন খারাপ কাজ? তাছাড়া ভগবান কৃষ্ণকে আপনি মাংসাহারী মনে করেন।
স্বামীজি: আমাদের এখন মাছ মাংস খাওয়া উচিত নাকি শাক-সবজি খাওয়া উচিত এটা নিয়ে বিতর্কের সময় নয়। পরাধীন ভারত মাতা যেখানে দিনের পর দিন বিদেশী শাসকদের কবলে সেখানে এরকম তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে আমরা কেন বিবাদ করছি? একদল মানুষ মাংসভোজী-দেরকে জোরপূর্বক ধর্মের দোহাই দিয়ে নিরামিষ ভোজী বানানোর চেষ্টা করছে। অবস্থা এমন যে মাংস খেলে ধর্মই থাকবে না। কিন্তু এখন কি আমাদের এটা নিয়ে কোলাহলের সময়? ধর্ম কি শুধু মাছ মাংস খাওয়ার উপর নির্ভর করে নাকি শুধু শাক-সবজি খাওয়ার উপর নির্ভর করে? আমার মাতা যেখানে শৃঙ্খলে আবদ্ধ সেখানে সন্তানদের এসব বলে ঘুম পাড়ানোর মানে কি? কাউকে না কাউকে তো জাগাতে হবেই। সে প্রসঙ্গেই বলা। আর কি বলতে পারি আমি। ভারতবর্ষের একটা প্রচলিত নিয়ম হয়ে গিয়েছে কেউ যদি একটু ধর্মের দিকে আকৃষ্ট থাকে তাহলে আমরা তাকে আরো দুর্বল ভেবে চেপে বসি। এগুলো হচ্ছে শক্তির অভাব। ঘোর তামসিকতা।
তাছাড়া ভগবান কৃষ্ণকে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে উনি কি ভক্ষণ করেছিলেন তার দ্বারা বিচার করি না। ক্ষত্রিয় যুবক তার ব্যক্তিগত খাদ্যাভ্যাস আর কি হতে পারে! তিনি আমাদের আদর্শও। তিনি ভক্তের আমিত্ব হরণ করেছেন। সেই মহিমাতে তিনি বিরাজমান। এক টুকরো মাংস তে তার মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না কিংবা নিরামিষ খাওয়ার কারণে তার মহিমা এতটুকু বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং এগুলো নিয়ে তর্ক করা বৃথা। আমাদেরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত হতে হবে ভয়হীন এবং নিজেদের সচ্চিদানন্দময় প্রকৃত স্বরূপকে জানতে হবে। এটাই হোক আমাদের জীবনের লক্ষ্য।
বৈষ্ণব: আপনি ঠিকই বলেছেন মহাশয়। এই মুহূর্তে আমাদের ঘুম ভেঙে উঠতে হবে। প্রকৃত ধর্মই হচ্ছে তাহলে ভয়হীন হওয়া। কিন্তু এখন পরাধীন ভারতের তাহলে উপায় কি হবে? ভারতবর্ষ কিভাবে জাগবে?
স্বামীজি: এইজন্য চাই রজগুণের উদ্দীপনা। পরাধীন ভারতকে জাগাতে হবে। না হলে কারোরই মুক্তি নেই। আমি তাই বলি, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এখন হৃদয়ে থাকুক। তোমরা সবাই কুরুক্ষেত্রের সিংহনাদকারী কৃষ্ণের পূজা করো, শক্তি পূজা করো। ঘরে ঘরে রামচন্দ্র রঘুবীরের পূজা চালিয়ে দাও। এই মুহূর্তে সাত্ত্বিকতার দোহাই দিয়ে একটি সম্পূর্ণ জাতিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা বন্ধ হোক। আমাদের এখন এসব নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ না করে পারলে মানুষের জন্য কিছু করা উচিত। নর-রূপী নারায়ণের সেবা; সেটাই হবে প্রকৃত ধর্ম।
বৈষ্ণব: সাধু! সাধু! অসাধারণ আপনার চিন্তাশক্তি। এই অধম এতদিন আপনার সম্পর্কে ভুল বুঝেছিল। আমায় ক্ষমা করুন,মহারাজ।
স্বামীজী: হে অমৃতের সন্তান, তুমি অধম নও। মনের দুর্বলতা পরিত্যাগ করো। সাহসী লোকেরাই পৃথিবীতে বড় বড় কাজ করতে পারে। তোমার কল্যাণ হোক।

(ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে রচিত এবং সাক্ষাৎকারটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও স্বামীজীর বাণী গুলো হুবহু নয়, বরং লেখকের নিজের ভাষায় কিছুটা মূল ভাব একই রেখে পরিবর্তিত করা।
গুরুচণ্ডালী ও বানান ভুল জনিত দোষ ত্রুটি মার্জনীয়)



কায়স্থ জাতি ও বর্ণব্যবস্থা

সপ্তর্ষি বসু

ভারতবর্ষ সনাতন আর্য সভ্যতার অন্যতম প্রধান পীঠস্থান। প্রাচীনকাল থেকেই এই ভূমিতে আর্যগণ বিস্তৃতভাবে বসবাস করে আসছেন এবং তাঁদের সমাজব্যবস্থা মূলত বর্ণব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বর্ণব্যবস্থার উল্লেখ আমরা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে দেখতে পাই।
মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে–

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
একজাতিস্ত শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।।

(মনুস্মৃতি ১০/৪)

অর্থ: ব্রাহ্মণ , ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য– এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলা হয়, কারণ তাঁদের উপনয়ন-সংস্কারের অধিকার রয়েছে। চতুর্থ বর্ণ হলো শূদ্র, যাঁদের উপনয়ন নেই। এর অতিরিক্ত পঞ্চম কোনো বর্ণের অস্তিত্ব নেই।
প্রাচীন আর্য সমাজে মূলত এই চারটি বর্ণই প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়ের মতো অসংখ্য জাতি বা উপজাতির বিভাজন তখন গড়ে ওঠেনি। কালের প্রবাহে বিভিন্ন পেশা, সামাজিক অবস্থান ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। আজকের আলোচনার বিষয় এমন এক জাতি, যারা নিজেদের মেধা, কর্মদক্ষতা ও প্রশাসনিক যোগ্যতার মাধ্যমে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের নানা প্রান্তে বিশেষ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সেই জাতি হলো কায়স্থ।কায়স্থদের উৎপত্তি, ঐতিহাসিক বিকাশ, সামাজিক মর্যাদা এবং হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় তাঁদের প্রকৃত স্থান নিয়ে বহু যুগ ধরে আলোচনা ও মতভেদ বিদ্যমান। বিভিন্ন শাস্ত্র, ঐতিহাসিক দলিল এবং ব্রাহ্মণ বিদ্বানদের মতামতের আলোকে কায়স্থ জাতির পরিচয় ও বর্ণগত অবস্থান বিচার করার চেষ্টা করা
হইবে।

শাস্ত্রানুশীলন:

ইহা সকলেই অবগত আছেন যে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র জাতি উৎপন্ন হইয়াছেন। বেদ, পুরাণ ও সংহিতায় ইহার বহুল প্রমাণ আছে।

ঋগ্বেদে:- **ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ বাহুরাজন্যকৃত।**
উরু যদস্য তদ্বৈশ্যঃ পদ্যাং শূদ্রোহজায়ত।

মনুতে:- **লোকানান্ত বিবৃদ্ধ্যর্থ মুখবাহুরুপাদতঃ।**
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ।

ভবিষ্য পুরাণে:- **মুখতোহস্য দ্বিজা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াস্তথা।**
উরুভ্যাঞ্চ তথা বৈশ্যাঃ প্যাং শূদ্রাঃ সমুদ্ভবাঃ ॥

কিন্তু ইহাতে কায়স্থ বর্ণ কিরূপে উৎপন্ন হইলেন তাহার কোনো উল্লেখ নাই। সাধারণতঃ কায়স্থ শব্দের অর্থে শরীরে অবস্থিত বোঝায়। কেবল শরীরে অবস্থিত বলিলে, কাহার শরীর– এই প্রশ্ন আপনা হইতেই উদয় হয়। ইহার উত্তরে আমরা পদ্মপুরাণ হইতে প্রমাণ পাই যে ব্রহ্মার কায়া (শরীর) হইতে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি।

পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে–
ততোইভিধ্যায় তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসী প্রজাঃ।
তচ্ছরীরাং সমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞা সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।
তে সর্ব্বে সমবর্ত্তন্ত যে ময়া প্রাগুদাহৃতাঃ ॥

অতএব, আমরা উপরিউক্ত প্রমাণ হইতে দেখিতে পাই যে কায়স্থ জাতি ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। শ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের উদ্ভব বৃত্তান্ত বোধকরি সকলেই অবগত আছেন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মা জীবের সদসৎ কর্ম জ্ঞাপনের জন্য ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার শরীর হইতে একটি বিচিত্র ব্রহ্মপুরুষ নির্গত হইলেন, তাঁহার নাম চিত্রগুপ্ত এবং তিনি ব্রহ্মা কর্তৃক প্রাণীদিগের সদসৎ কর্ম স্থিরীকরণের জন্য ধর্মরাজ রূপে নিযুক্ত হইলেন। সেই চিত্রগুপ্ত দেবের পুত্রগণই পৃথিবীতে কায়স্থ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু ইহাতে কায়স্থগণের বর্ণ নির্ণয় হয় না। আসুন, এবার আমরা দেখব, শাস্ত্রে কায়স্থদের বর্ণ নিয়ে কি মতামত দেওয়া হয়েছে।

কায়স্থ বর্ণের শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি:

বিজ্ঞানতন্ত্র :-

নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোহসি মম কায়াদভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতি লোকে তব ভবিষ্যতি॥
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়বর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচন।
অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকা দশ॥
গর্ভাধান মৃতৌ কার্য্যং তৃতীয়ে মাসি পুংক্রিয়া।
মাসেহষ্টমে স্যাৎ সীমন্ত উৎপত্তৌ জাতকর্ম্ম॥
দশাহে নামকরণং পঞ্চমে মাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেহন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্॥
তথোপনয়নে ভিক্ষা ব্রহ্মচর্য্যব্রতকম্।
বাসো গুরুকুলেষু স্যাৎ স্বাধ্যায়াধ্যয়নং তথা॥
কৃত্বা তু মাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাং বিধায়চ।
আয়ুষ্যাণি চ শান্ত্যর্থং জপেদত্র সমাহিতঃ॥
কুর্য্যান্নান্দীমুখং শ্রাদ্ধং দধিমধ্বাজ্যসংযুতম্।
ততঃ প্রধানসংস্কারাঃ কার্য্যা এষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥

অর্থ: "তোমার নাম চিত্রগুপ্ত, আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব কায়স্থ বলিয়া জগতে খ্যাত হইবে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, কদাচ শূদ্র নহে। অতএব কায়স্থের গর্ভাধানাদি দশ সংস্কারই হইবে। ঋতুকালে গর্ভাধান, তৃতীয় মাসে পুংসবন, অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, সন্তান জন্মিলে দশম দিনে নামকরণ, পঞ্চম মাসে নিষ্ক্রমণ, ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন, কুলরীতি অনুসারে চূড়াকরণ, তদ্রূপ উপনয়নে ভিক্ষা, ব্রহ্মচর্যব্রতাদি, গুরুগৃহে বাস, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি কায়স্থদিগের কর্তব্য। মাতৃকাপূজা করিয়া, বসুধারা রচনা করিয়া, শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গলার্থ সমাহিত চিত্তে জপ করিবে। দধি, মধু ও ঘৃত সংযুক্ত নান্দীমুখ শ্রদ্ধা করিবে। এইসকল অনুষ্ঠান পূর্বক প্রধান সংস্কারসমূহ করিবে, ইহাই বিধি।"

বিষ্ণু সংহিতায় :-

অথ লেখ্যং ত্রিবিধং। রাজসাক্ষিকম্ সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ।
রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।। (৭/৩)

অর্থ: 'লেখ্য বা দলিল তিন প্রকার– রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক ও অসাক্ষিক। রাজার ধর্মাধিকরণে রাজনিযুক্ত কায়স্থ কর্তৃক লিখিত এবং ধর্মাধিকরণের অধ্যক্ষের করচিহ্নিত যে দলিল, তাহাই রাজসাক্ষিক।'

বৃহৎপরাশর সংহিতায়:-

শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতাম্।
লেখকানি প কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্য বিচক্ষণান্।। (১০/ ১০)

অর্থ: 'রাজা শুচি, জ্ঞানবান, ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে মুদ্রাকরান্বিত করিবেন (সহি-মোহর প্রয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করিবেন); এবং লেখ্য-রচনায় বিচক্ষণ কায়স্থদিগকে লেখক নিযুক্ত করিবেন।'

শুক্রনীতিসারে :-

ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখক স্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ ॥ (৪/২/৮)

অর্থ: 'গ্রামনেতা পদে ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিবে, লেখক পদে কায়স্থকে, তহসিলদার পদে বৈশ্যকে এবং চৌকিদার পদে শূদ্রকে নিযুক্ত করিবে।'

এস্থলে আমরা বুঝতে পারছি যে কায়স্থদের নির্দিষ্টভাবে লেখক কার্যে নিযুক্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাহলে একজন লেখকের কি কি গুণাবলির কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে তাও দেখা কর্তব্য; যথা–

মৎস্য পুরাণে :-

উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তমঃ॥ (১১৫ অঃ)

অনুবাদ: রাজকার্যে ও লিপি–লিখনাদিতে যে স্থলে যেরূপ বাক্য প্রয়োগ আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিতে যিনি দক্ষ, যিনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অল্প কথায় যিনি বহু অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন–এমন ব্যক্তি রাজার লেখক হইবেন।

গরুড় পুরাণে (উত্তর খণ্ড):-

মেধাবী বাকপটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ॥ (১১২ অঃ)

অনুবাদ: যিনি সর্বশাস্ত্র সম্যক দর্শন করিয়াছেন, যিনি মেধাবী, বাকপটু, প্রাজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও সাধু– তিনি রাজার লেখক হইবেন।

'সর্বশাস্ত্র সম্যক' ও 'সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত' শব্দের উপর আলোকপাত করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে এই লেখক দ্বিজাতিই।

এছাড়াও নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে, কায়স্থ = গণক বা লিপিকার এবং এই গণক বা লিপিকার = ক্ষত্রিয়; যথা— অমরসিংহ রচিত 'অমরকোষ' অভিধানে ক্ষত্রিয় বর্গের মধ্যে লেখক জাতির স্থান নিঃসংশয়রূপে নির্ধারিত হইয়াছে। ৭৪৩ শ্লোকে:

"লিপিকারোহক্ষরচনোহক্ষরচঞ্চুশ্চ লেখকঃ।" –ক্ষত্রিয় বর্গ।

পণ্ডিতকুলপতি বাচস্পতি মহাশয়ের রচিত 'বাচস্পত্য অভিধান' সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও

প্রামাণিক অভিধান। ইহাতে কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বাচস্পতি মহাশয় যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব:

কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রায়াং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।
রামায় স দালভ্যেন ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্ বহিষ্কৃতঃ॥
কায়স্থধর্ম্মো দত্তোহস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ।

এস্থলে "ক্ষাত্রধর্মাদ্ বহিষ্কৃত" এই কথা থাকায় কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে পরশুরামের আজ্ঞায় উপনয়নাদি সংস্কার হইতেও কায়স্থগণ বারিত হইয়াছেন। এস্থলে ক্ষাত্রধর্ম দ্বারা যুদ্ধ ও প্রজা-পালন বুঝিতে হইবে। উপনয়ন দশসংস্কারের অন্তর্গত একটি সংস্কার। যদি ক্ষাত্রধর্ম বলিতে উপনয়ন বুঝায়, তবে গর্ভাধান, চূড়াকরণ প্রভৃতি কেন বুঝাইবে না? তবে কি চন্দ্রসেনপুত্রের সকল সংস্কারই লোপ হইয়াছিল? চিত্রগুপ্তের কায়স্থধর্ম তাহাকে দেওয়া হইল– ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে উপনয়নাদি সংস্কার ও বেদাধিকার তাহার ছিল, অন্য জাতির ধর্ম হইতে পৃথক ক্ষত্রিয়ের যে যুদ্ধাদি ধর্ম, তাহাই লোপ হইয়াছিল। কোষকার বাচস্পতি মহাশয়ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন:-

"অত্র ক্ষাত্রধর্মাদ্বহিষ্কৃতঃ ইত্যনেন সগরেণ কাম্বোজাদীনামিব তস্য তত্বংশস্য চ ক্ষত্রিয়ধর্ম যুদ্ধোপনয়নাদিরাহিত্য প্রতীতাব চিত্রগুপ্ত-ধর্মত্বদানকথনেন উপনয়নাদিসত্ত্বং বেদাধিকারিত্বঞ্চ সূচিতং তেন কেবল যুদ্ধাদিরাহিত্যমাত্রং। চিত্রগুপ্তধর্মত্বদানেন লেখনাধিকারঃ সূচিতঃ।"

ত্রিশতাধিক বৎসর পূর্বে কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত গাগাভট্ট তদীয় "কায়স্থ ধর্ম প্রদীপে" এই স্কন্দপুরাণীয় বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন–

"ক্ষাত্রধর্মশব্দঃ শৌর্য্যাদি ক্ষত্রিয়সাধারণধর্মপরঃ নতু শ্রৌতস্মার্ত্ত যাবদ্ধর্মপরঃ। যজ্ঞদানতপঃশীলা ব্রততীর্থরতাঃ সদা ইত্যুপসংহৃতে উপক্রমোপসংহারাভ্যামপি চান্দ্রসেনীয় কায়স্থানাং শুদ্ধক্ষত্রিয়ত্বং প্রতীয়তে।"

সাহিত্য প্রমাণ:

কবি কর্ণপূর 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের নবম অঙ্কে লিখিয়াছেন:–

"কেশববসু তদমাতোন কথিতম্-শূরত্রাণ শ্রীচৈতন্যনাম কোহপি মহাপুরুষঃ পুরুষোত্তমান্মথুরাং প্রযাতি তদ্দিদৃক্ষয়া অমী লোকাঃ সঞ্চরন্তি।"

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য হরিনাম করিতে করিতে মথুরার পথে তদানীন্তন গৌড়ের রাজধানী রামকেলীতে উপস্থিত হইয়াছেন। চতুর্দিকে অগণিত লোক। গৌড়ের মুসলমান শাসনকর্তা লোকসমাগম দেখিয়া বিচলিত হইলেন এবং অমাত্য কেশব বসুকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশব বসু বলিলেন–শূরত্রাণ (সুলতান), শ্রীচৈতন্য নামক এক মহাপুরুষ পুরুষোত্তম (পুরী) হইতে মথুরায় যাইতেছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য এই লোকসকল সঞ্চরণ করিতেছে।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে এই ঘটনা সম্বন্ধে বলিতেছেন:-

কেশবখানেরে রাজা ডাকি আনাইয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্ময় হইয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি নাম বোল যার॥

(অন্ত্যখণ্ড, ৪ অধ্যায়)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তদীয় 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে এই একই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন:-

গৌড়েশ্বর যবন রাজ্য প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া ॥
কেশব ছত্রিরে রাজা বার্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রি উড়াইয়া দিল ॥

দেখা যাইতেছে একই ব্যক্তিকে কেশব বসু, কেশব খান ও কেশব ছত্রি বলা হইয়াছে। 'খান' হলো নবাব প্রদত্ত উপাধি। 'ছত্রি' হলো ক্ষত্রিয় শব্দের অপভ্রংশ। মহাপ্রভুর সময়েও যে বাংলা দেশে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া

লোকে জানিত, তদ্বিষয়ে ইহা এক অন্যতম প্রমাণ।
অম্বষ্ঠকুলজাত শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীল গোবিন্দদাস তদীয় "প্রেমবিলাস" নামক বৈষ্ণব ইতিহাসের চতুর্বিংশতি বিলাসে গৌড়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের আগমন সংবাদে লিখয়াছেন:-

পঞ্চঋষির সঙ্গে দিলা ভৃত্য পঞ্চজন।
পঞ্চঋষির রক্ষাসেবা করিবার কারণ॥
যোদ্ধবেশধারী পঞ্চ ভৃত্য হন ক্ষত্র॥
ক্ষত্রিয় কায়স্থ এই ভৃত্য পঞ্চজন।
পঞ্চ ঋষির সঙ্গে গৌড়ে করিলা গমন ॥

এই গ্রন্থ ১৫২২ শকে (১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে) লিখিত হইয়াছে। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে ৩২৫ বছরেরও পূর্বে কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণতা এ দেশে অবিদিত ছিল না। কুলজী গ্রন্থের ভৃত্যাপবাদ বিস্তার লাভ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যেও অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। গোবিন্দদাস পঞ্চ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিবার পরও তাঁহারা ব্রাহ্মণদের ভৃত্যরূপে বাংলায় আসিয়াছিলেন–এই অমূলক প্রবাদ বিশ্বাস করিয়াছেন।

শিলালিপি প্রমাণ:

দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা ভোজবর্মার সময়ে অজয়গড় দুর্গের নিকট পর্বতোপরি বৃহদক্ষরে ১৬টি সুদীর্ঘ পংক্তিতে একটি শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই লিপিতে একটি শ্রীবাস্তব শাখার কায়স্থ বংশের কীর্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। সেই শিলালিপির কিছু অংশের সারমর্ম হলো–
১। টক্কারিকা নামক কায়স্থপল্লী সর্বদা শ্রুতিনিনাদে (বেদাচ্ছনিতে) মুখরিত হইত।
২। জাঙ্গুক শৈশবেই চতুর্দশ বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। চতুর্দশ বিদ্যা কী? চার বেদ, ছয়টা বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ) এবং ন্যায়, মীমাংসা, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র। [যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য বলেন– 'পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ।' ১ অধ্যায়]
অতএব নিশ্চয়রূপে জানা যাইতেছে যে পূর্বে কায়স্থগণ বিলক্ষণ বেদাভ্যাস করিতেন।
বিদ্যাসাগর মহাশয় ও স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত
(i) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রিপোর্ট:- ১৮৫০ বা ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে দুটি কায়স্থ বালক সংস্কৃত কলেজে পড়তে যায়। কিন্তু অধ্যাপকগণ পরামর্শ করিলেন যে তাহাদিগকে ভর্তি করা হইবে না। কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অবিচারে নিতান্ত ব্যথিত হন। শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ মার্চ (১২৫৮ বঙ্গাব্দের ৮ চৈত্র) এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত 'বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত' গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রিপোর্টের যে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, নিচে তাহা উদ্ধৃত হলো:
"যখন বৈদ্য কলেজে পড়িতে পারে, তখন কায়স্থ পারিবে না কেন? বৈদ্য শূদ্রজাতি। আর যখন শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্তদেবের জামাতা হিন্দু স্কুলের ছাত্র অমৃতলাল মিত্র সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকার পাইয়াছে, তখন অন্যান্য কায়স্থ পড়িবে না কেন? কায়স্থ ক্ষত্রিয়, আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কায়স্থেরা অধুনা বাংলার সম্ভ্রান্ত জাতি। আপাততঃ কায়স্থদিগকে সংস্কৃত কলেজে লওয়া উচিত।"
মহাপণ্ডিত অদ্বিতীয়চরিত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিমতের মূল্য কত অধিক তাহা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি অর্থের কাঙ্গাল ছিলেন না; কাহারও অনুরোধে জ্ঞান-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়াই তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।
(২) স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য:- শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতির মান ও গৌরব জগতের দৃষ্টিতে শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া, স্বীয় অসীম জ্ঞান ও প্রতিভায় সকলকে বিমোহিত করিয়া স্বামীজি যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন; যখন কলম্বো হইতে দাক্ষিণাত্যের নগরে নগরে সনাতন ধর্মের মহীয়সী বাণী প্রচার করিয়া তিনি

মাদ্রাজ (চেন্নাই) নগরে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার স্বদেশের-বঙ্গদেশের-কোনো কোনো সংবাদপত্রে তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া, সন্ন্যাসে অনধিকারী বলিয়া গালি দিতে লাগিল। তিনি মাদ্রাজের এক বক্তৃতায় এই অভিযোগের উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন:
'আমি সমাজসংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে–তাহারা বলিতেছে–আমি শূদ্র; আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে–শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে? ইহাতে আমার উত্তর এই–যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস করো, তবে জানিও, আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর, যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ–"যমায় ধর্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ"–মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, আর যাঁহার বংশধর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়।'
অপরদিকে, উদ্বোধন কার্যালয় হইতে স্বামী সত্যকাম কর্তৃক প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের "পত্রাবলী, প্রথম ভাগ"-এ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে স্বামী বিবেকানন্দ কোনো কায়স্থ শিষ্যাকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত হইল: "নিত্য যথাশক্তি গীতা পাঠ করিও। তুমি দাসী কেন লিখিয়াছ? বৈশ্য ও শূদ্রেরা দাস ও দাসী লিখিবে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেব ও দেবী লিখিবে। আপন আপন গোত্র নাম অর্থাৎ পতির নামের শেষভাগ বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা, যথা অমুক মিত্র ইত্যাদি।"

বিদ্বান পণ্ডিতদের ঐতিহাসিক ব্যবস্থা:

(১) কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা (১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ):- মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী প্রমুখ কাশী, দ্রাবিড় ও বাংলার ৯৫ জন পণ্ডিত ১৯৩০ সংবতে (১২৭৯ বঙ্গাব্দে) কাশীর প্রাড়্বিবাক (প্রধান বিচারক) বিহারীলাল কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত সুদীর্ঘ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন।
"অথ কায়স্থপদেন ব্যবহ্রিয়মাণানাং বিবিধানাং জনানাং মূল পুরুষাঃ কিং জাতীয়াঃ শাস্ত্রতঃ সিধ্যন্তীতি প্রশ্নে। উত্তরম্। কায়স্থপদং ন তাবৎ সর্বেষাং কায়স্থপদব্যবহার্য্যাণামেক রূপেণ বোধনে ক্ষমং কিন্তু চিত্রগুপ্তসন্ততৌ চন্দ্রসেনসন্ততৌ চ ক্ষত্রিয়ত্বব্যাপ্যজাতিবিশেষপুরস্কারেণ প্রবর্তমানং তয়োরেব মুখ্যম্। অন্যেষু সঙ্করজাতীয়েষু তু কায়স্থপদপ্রবৃত্তি নিমিত্তঘটকপাটীবীজগণিতাদি বৃত্তি সাধর্ম্মেণ প্রবর্তমানং গৌণম্।"
অর্থ: কায়স্থ শব্দে, কায়স্থ নাম ব্যবহারকারী সকল লোককেই এক রূপ বুঝাইবে–এমন নহে। কায়স্থ শব্দে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত চিত্রগুপ্ত সন্তান ও চন্দ্রসেন সন্তানকে মুখ্যরূপে বুঝায়। এতদ্ভিন্ন অন্য সঙ্কর জাতিদের মধ্যে যাহারা কায়স্থ নাম লাভে উৎসুক হইয়া ঘটকপাটি, বীজগণিতাদি বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক কায়স্থ নামে পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে গৌণভাবে বুঝায়।
এই ব্যবস্থার প্রথমে পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডের কয়েকটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মর্ম এই যে, মাণ্ডব্য মুনি তাঁহার অল্প অপরাধ চিত্রগুপ্তের লেখায় বহুতরীকৃত হইয়াছে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ করেন, 'হে লেখক, তুমি ধর্মচ্যুত হইয়া শীঘ্র পাপীয়ান হও।' ইহাতে মহাবল চিত্রগুপ্ত প্রব্যথিত হইয়া মাণ্ডব্য ঋষির উপাসনা করিলেন। মাণ্ডব্য সন্তুষ্ট হইয়া যাহা বলিলেন, তন্মধ্যে এই কথাটি দ্রষ্টব্য:
দ্বিজাতীনাং যথা দানং যজনাধ্যয়নং তথা।
বৈশ্যাদুচ্চা তু তদ্বৃত্তি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদধঃ॥
অর্থ: চিত্রগুপ্ত সন্তানের দ্বিজাতির কর্তব্য দান, যজ্ঞ ও বেদপাঠে অধিকার থাকিল, কিন্তু তাহার বৃত্তি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় অপেক্ষা নিম্ন এবং বৈশ্যের বৃত্তি হইতে উচ্চ নির্দিষ্ট হইল।
তৎপর পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ডের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্বশেষে ভবিষ্যপুরাণান্তর্গত কার্তিক শুক্লদ্বিতীয়া ব্রতকথা সন্দর্ভ সবিস্তার উদ্ধৃত হইয়াছে। ধর্মশর্মার কন্যা ইরাবতীর সহিত চিত্রগুপ্তের বিবাহ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেনঃ
"অত্র ধর্মশর্ম্মকন্যাং চিত্রগুপ্তো বিবাহ্য তস্যাং পুত্রান্ জনয়ামাসেতি স্পষ্টম্। তত্র শর্ম্মান্তপদপ্রয়োগেন তস্য ব্রাহ্মণত্বাবগত্যা তৎকন্যা সন্ততে ব্রাহ্মণত্বস্য সম্ভাবয়িতুং শক্যত্বাদিতি চেদত্রোচ্যতে প্রদর্শিত প্রমাণকদম্বেন তেষাং ক্ষত্রিয়ত্বসিদ্ধ্যা ধর্মশর্ম্মণা ক্ষত্রিয়ায় কন্যেরাবর্তীতি কল্পনাৎ। অসবর্ণ বিবাহস্যাপি যুগান্তরীয় ধর্মতায়া: স্মৃত্যাদিসিদ্ধত্বাৎ।"
ইত্থঞ্চ মুখ্যকায়স্থপদব্যবহার্য্যাণাং চৈত্রগুপ্তানাং চান্দ্রসেনানাঞ্চ মূলপুরুষাঃ ক্ষত্রিয়া এবেতি সিদ্ধম্। ইতি শম্।

এই ব্যবস্থায় যে সকল পণ্ডিতগণ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁদের নাম নিচে দেওয়া হলো–
১) মহামহোপাধ্যায় শ্রী বাপুদেব শাস্ত্রী; ২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি; ৩) পণ্ডিত শ্রীঅম্বিকাদত্ত ব্যাস; ৪) সখারাম ভট্ট; ৫) ভৈরবদত্ত; ৬) অনন্ত ভট্ট শর্মা; ৭) ভিকুজি পন্ত; ৮) রাজারাম শাস্ত্রী; ৯) নারায়ণ ভট্ট; ১০) চুন্টীরাজ ধর্মাধিকারী; ১১) বামনাচার্য; ১২) রামচন্দ্র শাস্ত্রী; ১৩) বিভব-রাম; ১৪) বালকৃষ্ণ শাস্ত্রী; ১৫) নরসিংহ শাস্ত্রী মানবল্লী; ১৬) নারায়ণ শাস্ত্রী; ১৭) গণেশ শাস্ত্রী শ্রৌতি; ১৮) বালা শাস্ত্রী আচার্য; ১৯) পুরুষোত্তম শাস্ত্রী; ২০) গঙ্গাধর শাস্ত্রী; ২১) রাজারাম মোহদল স্মার্ত; ২২) ধোণ্ড শাস্ত্রী; ২৩) নানা শাস্ত্রী; ২৪) চুন্টীরাজ দীক্ষিত চিতলে; ২৫) কেশব শর্মা মরাঠা; ২৬) রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী পট্টবর্ধন; ২৭) দামোদর শাস্ত্রী; ২৮) বিশ্বনাথ শাস্ত্রী; ২৯) রক্ষপাল; ৩০) বলদেব শাস্ত্রী; ৩১) গোবিন্দ আচার্য; ৩২) বিশ্বনাথ অগ্নিহোত্রী; ৩৩) সিদ্ধেশ্বর জ্যোতির্বিদ; ৩৪) ভৈয়া শাস্ত্রী; ৩৫) মদনমোহন শিরোমণি; ৩৬) মধুসূদন ন্যায়বাগীশ; ৩৭) কাশীনাথ পর্বত্বীয়; ৩৮) হরিকৃষ্ণ ব্যাস; ৩৯) যজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রী মহাবল; ৪০) বাল শাস্ত্রী রাণাডে; ৪১) লক্ষ্মীনাথ দ্রাবিড়; ৪২) বৈদ্যনাথ দীক্ষিত চতুর্ধর; ৪৩) তারাচরণ তর্করত্ন; ৪৪) শীতল প্রসাদ ত্রিপাঠী; ৪৫) স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী; ৪৬) যাগেশ শর্মা; ৪৭) লক্ষ্মণ জ্যোতির্বিদ; ৪৮) বস্তিরাম দ্বিবেদী; ৪৯) জবাহীর ত্রিপাঠী; ৫০) আনন্দ চন্দ্র সার্বভৌম; ৫১) রামমনোরথ দ্বিবেদী; ৫২) শিবরাম শাস্ত্রী; ৫৩) রাজাজি জ্যোষী; ৫৪) রামযশন শাস্ত্রী।
(২) বাংলার পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা: বাংলার চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা নিম্নরূপ–
"চিত্রগুপ্তবংশজাতানাং কায়স্থানাং মূলপুরুষস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন ক্ষাত্রয়সন্তানত্বেহপি সুচিরকালং পুরুষপরম্পরয়া উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপাৎ ইদানীং ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব মিতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।"
স্বাক্ষর: মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন (নবদ্বীপ), শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন (পূর্বস্থলী), শ্রীশিবচন্দ্র সার্বভৌম (ভাটপাড়া), শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (কলিকাতা), শ্রীগোবিন্দ শাস্ত্রী (সংস্কৃত কলেজ), শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সংস্কৃত কলেজ)। শ্রী প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন (ভাটপাড়া), শ্রীচন্দ্রশেখর চূড়ামণি (কলিকাতা), শ্রীভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ, শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীশশিভূষণ তর্করত্ন, শ্রীকেদারনাথ শিরোমণি (নবদ্বীপ), শ্রীসতিকণ্ঠ বাচস্পতি, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শ্রীশিবনাথ সার্বভৌম, শ্রীনৃসিংহদাস স্মৃতিভূষণ (বাঁশবেড়ে)।
উপসংহার:
উপরোক্ত বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কায়স্থগণ বর্ণব্যবস্থার দ্বিতীয় বর্ণ অর্থাৎ 'ক্ষত্রিয়বর্ণ' ভুক্ত। সাময়িকীতে প্রকাশের সুবিধার্থে লেখাটির কলেবর বৃদ্ধি না করে মূল বিষয় ও প্রধান প্রমাণসমূহ এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

তথ্যসূত্র:
কায়স্থ সমাজের সংস্কার, গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার
ব্রহ্মকায়স্থ, শ্রী ললিতাপ্রসাদ দত্ত



বুদ্ধ ও কিছু কথা

উচ্ছ্বাস তালুকদার

তিথি অনুযায়ী আজকের পূর্ণিমা বিশেষভাবে বৌদ্ধ পূর্ণিমা নামে পরিচিত। বুদ্ধ চরিতে আছে -
শাখামালম্বমানায়াঃ পুষ্পভারাবলম্বিনীম্।
দেব্যাঃ কুক্ষিং বিভিদ্যান্ড বোধিসত্ত্বো বিনির্যয়ৌ।।
ততঃ প্রসন্নশ্চ বভূব পুষ্যস্তস্যাশ্চ দেব্যা ব্রতসংস্কৃতায়াঃ।
পার্শ্বাৎসুতো লোকহিতায় যজ্ঞে নির্বেদনং চৈব নিরাময়ং চ ।।

(বুদ্ধ চরিত, ১/২৪-২৫)

অনুবাদ: দেবী যখন এক পুষ্পভারাবনত শাখা অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার কুক্ষিভেদ করিয়া অবিলম্বে বিনির্গত হইলেন। সেই সময় পুষ্য নক্ষত্র প্রসন্ন হইল। ব্রতসংস্কৃতা দেবীর পার্শ্বদেশ হইতে, বিনা বেদনায়, নিরাময়ে, এক পুত্র, লোকহিতের জন্য জন্মগ্রহণ করিলেন।
(তবে প্রথম শ্লোকটি প্রচলিত সব সংস্করণে পাওয়া যায় না, সেসব সংস্করণে দ্বিতীয় শ্লোকটি ১/৯ নং এ পাওয়া যায়)

• সেদিন দেখলাম একজন, বুদ্ধকে ভিক্ষুক বলে কটাক্ষ করছিল। কিন্তু, সন্ন্যাস আশ্রমে ভিক্ষা করা যে একটি কর্তব্য সেটা সেই ব্যাক্তি হয়তো জানেন না। এমনকি গৌতম বুদ্ধ ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র, বংশ ছিল শাক্য বংশ। এনারা মূলত ইক্ষাকু বংশ থেকেই এসেছে, যে বংশে রাম জন্ম নিয়েছিলেন। বুদ্ধচরিতের প্রথম শ্লোকেই পাওয়া যায় -

ইক্ষাকুবংশার্ণ বসম্প্রসূতঃ প্রেমাকরশ্চন্দ্র ইব প্রজানাম্।
শাক্যেষু সাকল্যগণাধিবাসঃ শুদ্ধোদনাখ্যো নৃপতির্বভূব।।

(বুদ্ধচরিত, ১/১)

অনুবাদ: ইক্ষাকু বংশসমুদ্র থেকে উদ্ভূত, প্রজাদের কাছে প্রেমময় চন্দ্রের ন্যায়, শাক্যদের মধ্যে সকল গুণের আধার— 'শুদ্ধোদন' নামে এক রাজা ছিলেন।

হিন্দুদের বিভিন্ন শাস্ত্র (পুরাণ ইতিহাস আদি গ্রন্থ) ও আচার্য্য গ্রন্থেও বুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিষ্ণুর নবম অবতার হচ্ছে - বুদ্ধ। তবে, অনেকে আজকাল দাবি করেন - অবতার বুদ্ধ আর, বৌদ্ধদের বুদ্ধ এক নয়। কিন্তু, আমি যতদূর পড়েছি তাতে এই ধারণা ভ্রান্ত বলেই মনে হয়। বিষ্ণু অবতার বুদ্ধ আর বৌদ্ধদের বুদ্ধ একই। শঙ্করাচার্যের দশাবতার স্তোত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুরাণে (যেমন - বিষ্ণু ভাগবত পুরাণ, গরুড় পুরাণ, অগ্নি পুরাণ ইত্যাদি) বুদ্ধ অবতার নিয়ে পাওয়া যায়। সব জায়গাতেই আছে যে - দেব বিদ্বেষী অসুরদের মোহিত করার জন্য কিংবা বেদ বিমুখ করার জন্যেই মূলত বুদ্ধ অবতার জন্ম নেন। তবে, পুরাণের হিসেবে যে একাধিক বুদ্ধ অবতার থাকতে পারে না, সেটাও বলা যায় না। তথাপি, সিদ্ধার্থ গৌতম যে বিষ্ণু অবতার সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। এমনকি রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের মতেও বৌদ্ধদের বুদ্ধকেই শঙ্করাচার্য দশাবতার স্তোত্রে অবতার হিসেবে মেনেছেন। অগ্নিপুরাণে সরাসরি শুদ্ধোধন পুত্র বলা হয়েছে - **'...শুদ্ধোদনসুতোঽভবৎ...'** (খণ্ডাংশ, ১৬/২)। কিন্তু, বিষ্ণু ভাগবত আদি পুরাণে বুদ্ধের জন্মস্থান ও পিতা মাতার নাম নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে গভীর ঐতিহাসিক বিচার দ্বারা সম্ভবত সমাধান করা সম্ভব নতুবা শাস্ত্রীয়ভাবে সমাধান এটাই হবে যে - যেহেতু কল্পভেদ বিচার মানা হয় তাই অন্য কল্পের বুদ্ধ অবতার নিয়ে হয়তো বলা হয়েছিল।

যাই হোক, যে বুদ্ধই হোক না কেন আমাদের কাছে অবশ্যই পূজনীয়। বুদ্ধ নিজে নাস্তিক ছিলেন কি না সে নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সন্দেহের কারণ দেখা যাক বৌদ্ধদের অন্যতম মান্য গ্রন্থ ত্রিপিটক থেকেই -

অগ্গিহুত্তমুখা যঞ্ঞা, সাবিত্তী ছন্দসো মুখং,
রাজা মুখং মনুস্‌ সানং, নদীনং সাগরো মুখং।
ন্যত্তানং মুখং চন্দো, আদিচ্চো তপতং মুখং,
পুঞ্ঞঞং আকঙ্খমানানং, সংঘো বে যজতং মুখ'ন্তি।

(সুত্ত পিটক: সুত্তনিপাত, মহাবগ্গ, সেল সুত্তং, ২১-২২)

অনুবাদ: অগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রধান উপাদান, সাবিত্রী ছন্দের প্রধান; মানুষের মধ্যে রাজা প্রধান এবং নদীর বা জলাশয়ের মধ্যে প্রধান হইল সাগর। চন্দ্র তারকাদের প্রধান, জ্বলন্ত জিনিসের মধ্যে প্রধান সূর্য পুণ্যকামী ও দানযজ্ঞ সম্পাদনকারীদের জন্য সংঘই প্রধান।

- লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এখানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দশম অধ্যায়ের ন্যায় কিছু বিষয় বর্ণিত হচ্ছে এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞের বিষয় ও সাবিত্রী ছন্দ তথা গায়ত্রীর প্রশংসার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও, শঙ্করাচার্য বৌদ্ধদের সঙ্গে তর্কের সময় বলেছিলেন - 'ভগবান বুদ্ধ এই বেদজ্ঞান সাহায্যেই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। আপনারা তাঁহার কথা না বুঝিয়াই বিরোধ করিয়া থাকেন।' অর্থাৎ, বেদ বিরোধী তথা নাস্তিক বৌদ্ধগণ আদতে বুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ, মান্যতা আদি বুঝতে অক্ষম ছিল বলেই মনে হয়।

• এবার নব বৌদ্ধদের মত ও কিছু ইতিহাস বিচার বিশ্লেষণ করা যাক। নব বৌদ্ধগণের ইতিহাসের জ্ঞান মনে হয় শূন্যের কোটায় পৌঁছেছে। তারা আজকাল দাবি করে বেড়াচ্ছে যে - বৌদ্ধ ধর্ম থেকেই নাকি সনাতনের সৃষ্টি। প্রায় সব ইতিহাসবিদগণ দাবি করেন - ঋগ্বেদ সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্য (রচনাকাল - আনু. ১৫০০ খ্রি. পূ.) এবং বৌদ্ধ সাহিত্যগুলো বুদ্ধের মৃত্যুর পরই রচনা হয়েছিল। তবে, ইতিহাস বিচারে গৌতম বুদ্ধের সময় থেকেই গ্রন্থে বর্ণিত উপদেশগুলো ছিল, বুদ্ধের মৃত্যুর পরে রাজগৃহে প্রথম সংকলিত হয়; সম্রাট অশোকের সময়েই তাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। সেই হিসেবে গৌতম বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বর্তমান ছিলেন (অধিকাংশ মত অনুযায়ী খ্রি. পূ. ৫৬৩) এবং এটাই প্রমাণ হয় যে, ঋগ্বেদের ঋষিদের অনেক পরেই বৌদ্ধ সাহিত্যগুলো উদ্ভব হয়। তাদের একটি জনপ্রিয় বিষয় হচ্ছে - রামায়ণের প্রচলিত পাঠ তথা দক্ষিণী সংস্করণে বৌদ্ধদের উল্লেখ থাকায় বৌদ্ধকে সনাতনের থেকে প্রাচীন দাবি করা। কিন্তু, নর্থের পাঠে ও ইতিহাস গবেষকদের প্রিয় রামায়ণের ক্রিটিকাল এডিশনে এই বিষয়টি নেই। তাছাড়া, রামায়ণ যে গৌতম বুদ্ধের পূর্বে তার প্রমাণ সুত্ত পিটকের খুদ্দক নিকায় এর অন্তর্ভুক্ত ৪৬১ তম জাতক তথা দশরথ জাতকেই পাওয়া যায়। এই

জাতকে বুদ্ধ নিজেকে পূর্বে দশরথ পুত্র রাম ছিলেন বলে দাবি করেছেন। তাছাড়া, দীর্ঘনিকায়ের তেবিজ্জ সূত্রে কয়েক ধরনের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় - তন্মধ্যে অধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণ (যজুর্বেদের যজ্ঞের পুরোহিত), তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ (তৈত্তিরিয় শাখার), ছন্দোকা ব্রাহ্মণ (ছান্দগ্য শাখার) লক্ষণীয়। এগুলো ছাড়াও, দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে শুক্ল যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মের উদ্ভব বিষয়ক কাহিনী উল্লেখ করে খণ্ডনও করেছেন ও কেবট্ট সূত্রে ব্রহ্মের অবস্থান নিয়ে বক্রোক্তি দেখা যায়। অতএব, এটাও সিদ্ধ হলো যে - বুদ্ধের সময়ে উল্লেখিত সনাতন শাস্ত্র ও মতগুলো ছিল। এক কথায়, বেদান্তই বুদ্ধের পূর্বে উপস্থিত ছিল। বুদ্ধচরিতের ভূমিকায় পাওয়া যায় - হীনযান বৌদ্ধরা হচ্ছে প্রাচীন এবং তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা, ব্যক্তিপূজার কোন প্রসঙ্গই ছিল না; কিন্তু, মহাযানে শ্রদ্ধার বিষয় আছে ও এক্ষেত্রে শ্রদ্ধার ধারণা বেদান্তসারের ন্যায়ই। সিদ্ধান্ত এইযে যে, ইতিহাস ও নিজেদের গ্রন্থ না পড়েই নব বৌদ্ধগণ যে মনগড়া দাবি করে সেটাই উপলব্ধ হয়।

তথ্যসূত্র:

১) অশ্বঘোষ কৃত বুদ্ধচরিত - তারাপদ ভট্টাচার্য
২) Buddhacarita of Asvaghosha - E. B. Cowell
৩) বুদ্ধদেব যখন সিদ্ধার্থ ছিলেন - দীপান ভট্টাচার্য
৪) আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ - রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
৫) শঙ্করাচার্য গ্রন্থমালা - পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত
৬) শ্রীমদ্ভাগবত (বিষ্ণু ভাগবত) - গীতাপ্রেস এবং শ্রীধর টীকা অনুবাদ
৭) গরুড় পুরাণ - নবভারত পাবলিশার্স
৮) অগ্নি পুরাণ - নবভারত পাবলিশার্স
৯) ত্রিপিটক - ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ
১০) ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন
১১) ভারতবর্ষের ইতিহাস - রোমিলা থাপার
১২) উপনিষৎ ও বুদ্ধ - সাধনকমল চৌধুরী
১৩) বিভিন্ন আন্তর্জাল সূত্র



জগন্নাথাষ্টকম্ এর প্রথম শ্লোক বা স্তবক এবং কিছু সংশয় নিরসন

সাত্যকি দেব

আদিগুরু শঙ্করাচার্য রচিত 'জগন্নাথাষ্টকম্' সম্পর্কে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। তবে, কিছুদিন ধরে দেখছি অনেক বৈষ্ণব বিশেষ করে যারা আদিগুরুর মতদর্শন তথা অদ্বৈতবাদের বিরোধী এবং অদ্বৈতবাদকে প্রায়ই মায়াবাদ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ইত্যাদি বলে থাকেন, তারাই এই স্তোত্রের প্রথম শ্লোক খুব করে প্রচার করছেন। শুরুতেই শ্লোকটি বা স্তবকটি দেখে নেওয়া যাক -

কদাচিৎ কালিন্দী-তট-বিপিন-সংগীত-কবরো
মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চ্চিত-পদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে।।

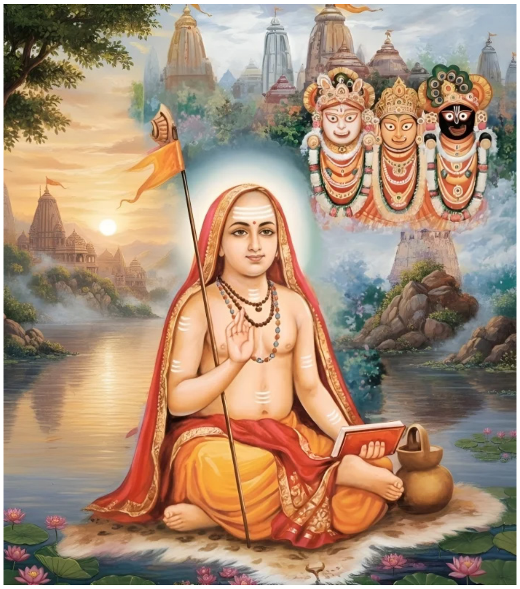
(জগন্নাথাষ্টকম্ -১)

অনুবাদ: যিনি কোন সময়ে যমুনাতীরবিপিনে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত করিয়াছিলেন, সানন্দে গোপীগণের মুখকমল-আস্বাদ গ্রহণে যিনি মধুকর, যাঁহার চরণযুগল লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশের দ্বারা অর্চ্চিত, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হয়েন।

মূলত, ঈশ্বরের অন্যান্য রূপের দ্বারা জগন্নাথের অর্চনার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে দেখেই এই শ্লোক বা স্তবকটি নিন্দুকেরাও খুব করে প্রচার করছে। কিন্তু, আদিগুরু রচিত অন্যান্য গ্রন্থ বা স্তোত্রকে পড়েও দেখছে না। এমনকি এটা যে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি সেটাও উনারা বুঝতে পারছেন না। শাস্ত্রের সর্বত্রই যেখানে একজনের স্তুতি করা হচ্ছে সেখানে অন্যান্য রূপকে স্তুতিকারী হিসেবে প্রদর্শন করা হয় এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আপেক্ষিক নিন্দাও করা হয়। এইসবের সমাধানের জন্যেই 'ন হি নিন্দা ন্যায়' দ্বারা বিচার করতে হয়; অর্থাৎ, যার বা যাদের নিন্দা

করা হচ্ছে সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়, শুধু প্রশংসাই গ্রহণযোগ্য। শাস্ত্রে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এইরকম ভেদ প্রায়ই দেখা যায় আর আদিগুরু ত শাস্ত্র বিরোধী নন তাই উনার রচিত স্তোত্রেও এইরকম ভেদ লক্ষিত হয়। আদিগুরু শঙ্করাচার্য নিজেই ব্যবহারিক দ্বৈতাদি ভেদ নিয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন -

ভাবাঽদ্বৈতং সদা কুয্যাৎ ক্রিয়াঽদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।



অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।।

(আদিগুরু শঙ্করাচার্য বিরচিত সারতত্ত্বোপদেশঃ - ৩)

অনুবাদ: সর্বদা অদ্বৈতভাব অবলম্বন করিবেন, কখনও ক্রিয়াতে অদ্বৈতভাব অবলম্বন করিবেন না-ক্রিয়াতে অদ্বৈতবুদ্ধি হইলে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হইবে না। তিন লোকে অদ্বৈতবুদ্ধি রাখিবে, কিন্তু গুরুর সহিত অদ্বৈতভাব করিবে না, গুরু ও শিষ্য এক হইলে কখনও জ্ঞান লাভ হইবে না।

★ এবার দেখে নেওয়া যাক অনুরূপ বিষয় ঈশ্বরের অন্যান্য রূপের ক্ষেত্রেও আদিগুরু কৃত বর্ণনা করার প্রমাণ -

অনাদ্যন্তমাদ্যং পরং তত্ত্বমর্থং,
চিদাকারমেকং তুরীয়ং ত্বমেয়ম্।
হরিব্রহ্মমৃগ্যং পরব্রহ্মরূপং,
মনোবাগতীতং মহঃ শৈবমীড়ে।।

(শিব-ভুজঙ্গ প্রয়াত-স্তোত্র - ২)

অনুবাদ: যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, অথচ যিনি সকলের আদি, যিনি পরমতত্ত্ববস্তু, যিনি অপ্রমেয়, চিন্ময়, অদ্বিতীয়, তুরীয়, হরি ও ব্রহ্মা যাঁহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন, যিনি পরব্রহ্মরূপী এবং মনোবাক্যের অতীত, সেই শৈবজ্যোতিঃ ভজনা করি।

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং,
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি
প্রণন্তং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি।।

(আনন্দলহরী - ১)

অনুবাদ: হে মাতঃ! শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি প্রভাবশালী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়েন; অন্যথা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয়েন না। এই হেতু জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাদি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবতা সকলেই তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন; ঈদৃশী অবস্থায় মাদৃশ অকৃতপুণ্য ব্যক্তি কিরূপে তোমাকে প্রণাম করিতে অথবা তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে?

★ আশা করি অনেকের মনের সংশয় দূর হবে এবং যারা সর্বদাই বিভেদ নিয়ে আছেন তারা বুঝবেন বিষয়গুলো। আমরা অদ্বৈত বিরোধীদের কিছু দাবির খণ্ডন করেছি বটে কিন্তু, সেটার উদ্দেশ্য বিভেদ ছড়ানো নয়। অদ্বৈত সর্বদাই অন্য সকল দর্শনকে স্থান দিয়ে আসছে। কারোর আরাধ্য নিয়ে কখনোই অদ্বৈত ভেদাভেদ করে না, বরং সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখাই এবং ব্যবহারিকভাবে যখন যার স্তুতি করা হবে তখন তাকেই সর্বোচ্চ মানাটাই আমাদের দর্শনের সিদ্ধান্ত। আপনারা আমাদের এই একতার উদ্দেশ্যকে বাধা দান করলেই আমরা আপনাদের ভুল দাবির যৌক্তিক খণ্ডন দেওয়ার চেষ্টা করি, প্রকৃত সত্য যা অনেকের বুঝতে অসুবিধে হয় সেগুলো সহজে বুঝানোর চেষ্টা করি!

জগন্নাথ দেব সবার মঙ্গল করুন🙏
জয় জগন্নাথ🙏

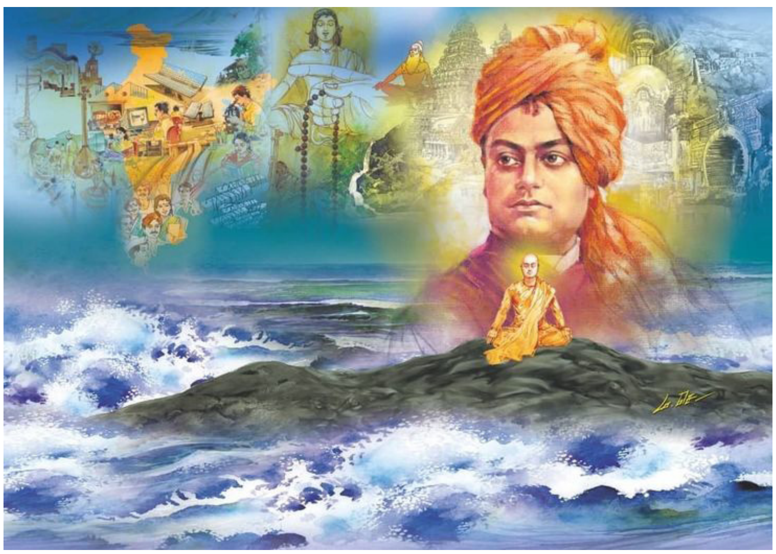
কাব্য কলম

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর বাণী ও রচনা

শ্রীজিৎ দত্ত

"বাণী তাঁর বীঠোফেন
মূর্ছনায়, ব্যঞ্জনাতে সে যেন বেজে-ওঠা পঞ্চম সিম্ফনি;
বাণী তাঁর হ্বাগ্নের– অপাবৃত দ্যুলোকের দুয়ার হতে সে যেন
ধেয়ে আসা ভাল্কিয়রীর ভীষণ জয়ধ্বনি।

বাণী তাঁর শ্রীগীতার অদ্বিতীয় দ্বিতীয়-অধ্যায়
যেথা রণ-উদ্যত দুই যুযুধান দলে স্তম্ভিত ক'রে
গর্জে ওঠে মানব–জীবনসংগ্রাম–সেনাপতি কেশবের বজ্রনির্ঘোষ–
ধীরগম্ভীর স্বরে, সজোরে।



তাঁর বাণী ধ্রুপদের মীড়ে, রুদ্রের বীণায়,
আড়ানা কি দুর্গার আলাপে ও তানে,
দুর্জয় অভীঃ মন্ত্রে, সঘন পাখোয়াজী বোলে ও ছন্দে,
শুনেছি মন্দ্র বাণী তাঁর– মুগ্ধ এ-দুটি কানে।

বাণী তাঁর, বারম্বার দিয়েছে অভয় তাকে,
এ সংসার–সাগরে যে–হয় দিশেহারা।

কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা– প্রদীপ্ত তব বাণী।
ধার করে।"

কবির বাণী : "তব বাণী গ্রহ চন্দ্র দীপ্ত তপন তারা॥"

কৃষ্ণ যদুমনী

নিরঞ্জন চন্দ্র দাস

কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথি অমানিশায় রজনীতে ধরাশায়ী ধরনী,
কংসের কারাগারে ধরনী আলোকিত করে আসিলো কৃষ্ণ যদুমনী।

কারাগারে জন্ম যাঁর, ঘুটঘুটে সেই রাতে,
ঝড়-বাদলের নদী পেরিয়ে এলেন মাতা যশোদার খাটে।
গোকুলের ধুলোবালি, মাখন চুরির হাসি,
রাখাল সেজে বাজাতেন তিনি মোহন সুরের বাঁশি।
বৃন্দাবনের কদমতলায় চলত কানাইয়ের খেলা,
দুষ্ট দমনে কেটে যেত তাঁর সারাটা বেলা।
কালীয় নাগের দর্প চূর্ণ, গোবর্ধন পর্বত কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে ধরা,
লীলা খেলায় ভরিয়ে দিলেন আমাদের এই বসুন্ধরা।
কংস বধের বীরত্বে ভাঙল পাপের মেলা,
এবার তিনি বিশ্ব ভ্রমণে বের হলেন রুদ্ধ করতে অধর্মের খেলা ।

গোকুল,মথুরা, বৃন্দাবন লীলা শেষ করে দিলেন পাড়ি ধর্ম স্থাপনে,
জয় মহাকাব্য ধন্য হয় কৃষ্ণের আগমনে।

কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের রথের সারথি হয়ে করলেন যুদ্ধ খেলা,
যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্ম স্থাপনে তিনিই রথী-মহারথীদের সাথে করলেন ছলনার খেলা।

গীতার বাণী শুনিয়ে দিলেন ধর্মের মহাসারে,
তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই হরি, বন্দি তারে বারে বারে।







সংস্কৃত সহজপাঠ - দৈনিক প্রয়োগে উপযোগী শব্দ ও বাক্য

সংস্কৃত শব্দ	সংস্কৃত বাক্য

अनिमेष (অনিমেষ) - পলকহীন
अवगुण्ठन (অবগুণ্ঠন) - আচ্ছাদন
उन्मीलन (উন্মীলন) - প্রস্ফুটন
ऋजुता (ঋজুতা) - সরলতা
कुहक (কুহক) - মায়া
संवित् (সংবিত্) - চৈতন্য
निर्वेद (নির্বেদ) - বৈরাগ্য
द्राक्षा (দ্রাক্ষা) - আঙুর
पनस (পনস) - কাঁঠাল
गोधूम (গোধূম) - গম

अनिमेषं तं दृष्ट्वा मनः मौनं भवति
অনিমেষং তং দৃষ্টা মনঃ মৌনং ভবতি
পলকহীন দৃষ্টিতে মন নীরব হয়

अवगुण्ठितं सत्यं कदाचित् प्रकाशते
অবগুণ্ঠিতং সত্যং কদাচিৎ প্রকাশতে
আড়াল সত্য একদিন প্রকাশ পায়

द्राक्षा मधुरा, स्मृतिः मधुतरा
দ্রাক্ষা মধুরা, স্মৃতিঃ মধুতরা
আঙুর মিষ্টি, স্মৃতি আরও মধুর

কোর্স করতে QR কোড স্ক্যান করুন বা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন...

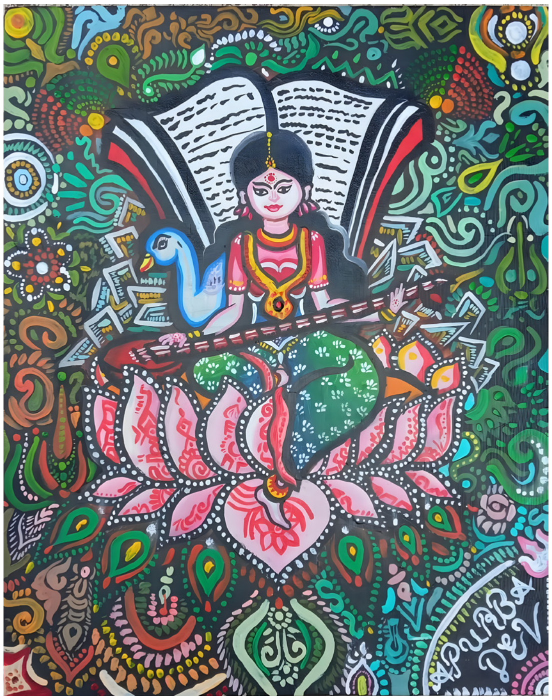
SCAN NOW



চিত্রাঙ্কন কলাম



অঙ্কনে: স্নেহা গাইন



অঙ্কনে: অপূর্ব দেব



আসছে নদী সূক্ত.......

ডিজিটাল কপি সংগ্রহ করুন আমাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে

ঋগ্বেদ সংহিতা ভাগের শাকল শাখার ১০ম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত, ৭৫ তম সূক্তটি হচ্ছে নদী সূক্ত। বাংলায় পরম্পরানুগ আচার্য্যদের ভাষ্যানুবাদ পাওয়া যায় না। তাই আপনাদের জন্য এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ। এই গ্রন্থটিতে আচার্য্য সায়ণ কৃত ভাষ্যানুবাদ থাকবে।



প্রশ্নোত্তর পর্ব: আপনাদের প্রশ্ন, আমাদের উত্তর

প্রশ্ন - ১: শাস্ত্র হিসেবে মূলত কোনগুলো মান্য করতে হয়?

উত্তর: মূলত অষ্টাদশ বিদ্যাই শাস্ত্র হিসেবে মান্য হয়ে থাকে। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে -
অঙ্গানি চতুরো বেদো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা তোশ্চতুর্দ্দশ।।
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্ত বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ।।
অনুবাদ - চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র, এই চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যা। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যা, অর্থ-শাস্ত্র অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র, এই বিদ্যা-চতুষ্টয় মিলিয়া অষ্টাদশ বিদ্যা হয়। (বিষ্ণু পুরাণ - ৩/৬/২৮,২৯)
বেদ ও বেদাঙ্গ নিয়ে শ্রুতিতেও বর্ণিত হয়েছে। বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ অনুযায়ী - 'সেই উভয় বিদ্যার মধ্যে অপরা বিদ্যা কথিত হইতেছে- ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ। অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।' (মুণ্ডক উপনিষদ - ১/১/৫)
সুতরাং, চার বেদ - ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ; ছয় বেদাঙ্গ - শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ; চার উপাঙ্গ - মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র এবং সবশেষে চার উপবেদ - আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীর প্রস্থানভেদ গ্রন্থ ও শাস্ত্র অনুযায়ী এই অষ্টাদশ বিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা আমাদের নিকট শাস্ত্র হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন - ২: শাস্ত্র বিচার কি? কোন শাস্ত্রকে অগ্রে প্রাধান্য দিতে হয়?

উত্তর: শাস্ত্রই মূলত ধর্মের নির্ধারক। বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে সংশয় নিরসন করার জন্যেই মূলত শাস্ত্র বিচারের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বিচার করতে হয়। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রের সঙ্গে শাস্ত্রের বিরোধ নিরসন করা। ব্যাস স্মৃতি বলছে -
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা।।
(ব্যাস স্মৃতি - ১/৪)
অনুবাদ: যেখানে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সেখানে শ্রুতিকথিত বিধিই বলবান এবং যেস্থলে স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সেস্থলে স্মৃতিকথিত বিধিই বলবান।
অর্থাৎ, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ এর মধ্যে বিচারে শ্রুতি সবচেয়ে অগ্রে ও পুরাণ সবার পশ্চাতে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন - ৩: অদ্বৈতবাদ দর্শন বুঝার জন্য করণীয় কি? কোন কোন বিষয়গুলো একদম প্রাথমিক স্তরে জানা উচিত?

উত্তর: অদ্বৈত বুঝার জন্য অদ্বৈতবাদের প্রকরণ গ্রন্থগুলো পড়া উচিত। যেমন - পঞ্চদশী, বেদান্তসার, অষ্টাবক্র গীতা, দৃগদৃশ্যবিবেক, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম ইত্যাদি। এছাড়া প্রস্থানত্রয়ীও পড়া উচিত। তবে কেউ যদি প্রথম থেকে শুরু করতে চান তাহলে চিদ্ঘনানন্দ পুরী রচিত অদ্বৈতবাদ গ্রন্থটি দিয়ে শুরু করতে পারেন।

আমাদের মতে অদ্বৈতবাদ নিয়ে একদম প্রাথমিক স্তরের বিষয় হচ্ছে - সত্য, মিথ্যা ও অসত্য শব্দের প্রকৃত অর্থ জানা। কারণ, বর্তমান সময়ে অদ্বৈতবাদের এই তিনটি শব্দের প্রকৃত অর্থজ্ঞান না থাকার কারণেই মূলত বিরোধীদের মনে ভুল ধারণা জন্মায়। সহজে এগুলোর অর্থ ও উদাহরণ নিম্নরূপ -
- সত্য হচ্ছে তাই যা কখনোই পরিবর্তন হয় না, যা কখনোই সৃষ্টি হয় না বা শুরু বা আদি নেই অর্থাৎ অনাদি, যার কোনো শেষ নেই অর্থাৎ অনন্ত। একমাত্র উদাহরণ হচ্ছে নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্ম।
- মিথ্যা হচ্ছে তাই যা আমরা দেখছি, অনুভব করছি (ব্রহ্ম অনুভব ছাড়া)। মিথ্যা মানে কিন্তু অসম্ভব বা অবাস্তব কিছু নয় আবার মিথ্যা মায়াও অনাদি তবে অনন্ত নয়। উদাহরণ: চেয়ার, টেবিল, অনুভূতি ইত্যাদি। জগৎকে ব্রহ্ম থেকে আলাদা কিছুর জ্ঞানটাই মূলত মিথ্যা।
- অসত্য হচ্ছে যা কখনোই সম্ভব নয়। উদাহরণ: বন্ধ্যার সন্তান ইত্যাদি।

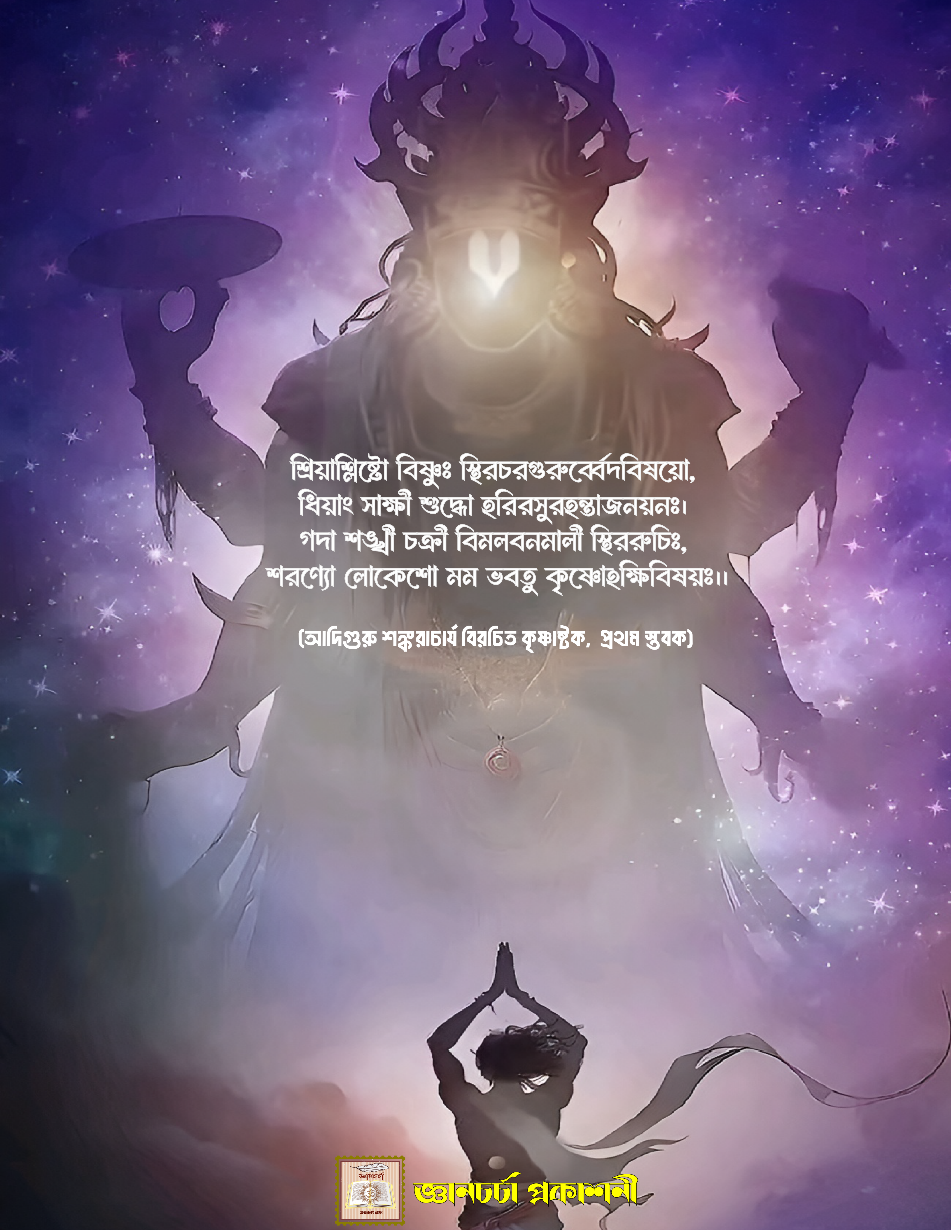
আপনার প্রশ্ন পাঠাতে অনুসরণ করুন অথবা স্ক্যান করুন

To: shashwata.satya@gmail.com

Subject: প্রশ্নোত্তর পর্ব

Compose email
প্রশ্ন - ....?
নাম - (বাংলায় আপনার নাম লিখবেন)
ঠিকানা - (উপজেলা, জেলা ও বিভাগের নাম লিখবেন)

Scan


শ্রিয়াশ্লিষ্টো বিষ্ণুঃ স্থিরচরগুরুর্বেদবিষয়ো,
ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো হরিরসুরহন্তাজনয়নঃ।
গদা শঙ্খী চক্রী বিমলবনমালী স্থিররুচিঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ।।
(আদিগুরু শঙ্করাচার্য বিরচিত কৃষ্ণাষ্টক, প্রথম স্তবক)
জ্ঞানচর্চা প্রকাশনী